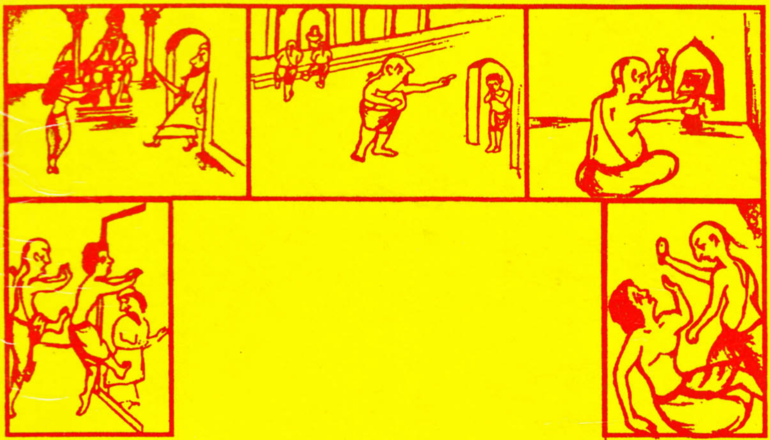


আত্মঘাতী হিন্দু.....!

উত্তরনের পথ



শ্রী প্রীতীশ তালুকদার

আত্মঘাতী হিন্দু....
উত্তরণের পথ

প্রীতীশ তালুকদার

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা -৭০০ ০৭৩
চলতে-চলতে : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

প্রকাশক ঃ

অরুন ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ

শুভ মহালয়া, ১৪২০

মুদ্রণ ঃ

ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১১এ, গড়পার রোড

কলকাতা- ৭০০০০৯

মূল্য ঃ ₹২৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ. অর্থ, বিদ্যা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, কোনো দিক থেকেই প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই আমি কিছু লিখব, আর তা পুস্তক আকারে কোনোদিন প্রকাশিত হবে, এ কল্পনাও কোনোদিন করিনি। তবে আগ্রহের বসে নিজ কাজের ফাঁকে ফাঁকে বইপত্র সংগ্রহ করে একটু-আধটু জানা ও বোঝার চেষ্টা করি নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে; আর তা থেকে যা জানতে, বুঝতে ও অনুভব করতে পারি তা আপন খেয়ালেই অনেক সময় লিখে ফেলি কোনো খাতার পৃষ্ঠায়। এ বিষয়টা যখন লিখছি ঠিক এরকমই এক মুহূর্তে ভ্রাতৃপ্রতিম প্রদীপ (প্রদীপ কুমার খান) জানতে পেরে তা পুস্তক আকারে প্রকাশের আবশ্যকতার কথা বলে। এরপর লেখাটার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া ও উৎসাহদান অব্যাহত রেখেছে, প্রুফ দেখে দিয়েছে, প্রয়োজনীয় অংশকে আরো ব্যাখ্যা করতে বলেছে, প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গেও সেই যোগাযোগ করেছে। তাই এই লেখা প্রকাশিত হলে প্রথম কৃতজ্ঞতা তাঁরই প্রাপ্য। এছাড়াও আমি ও প্রদীপ দুঃসাহস করে এই লেখাটাকে দেখে দেবার জন্য পূজনীয় স্বামীজী শ্রীমৎ প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের (ভারত সেবাশ্রম সংঘ) কাছে অনুরোধ নিয়ে যাই। পূজ্যপাদ স্বামীজী আমার মতো তুচ্ছ ব্যক্তির লেখাটাকেও আগ্রহভরে নিয়ে তাঁর অতি ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও তা দেখে দিয়ে এবং মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে এই পুস্তকের জন্য যথোপযুক্ত সমৃদ্ধ ভূমিকা লিখে দিয়ে তাঁর মহত্তের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁকে কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার জানা নাই, তাই কৃতজ্ঞতার কথা বলতেও চাই না। মাননীয় স্বামীজী বর্তমান পাঠকের সময়াভাবের কথা স্মরণ করিয়ে পুস্তকের বর্ণাশ্রমের অংশটা সংক্ষিপ্ত করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা করতে পারিনি তার কারণ, প্রথমত-(১) এ বিষয়ে পূর্বে কম বেশি অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু মূল উৎসকে তুলে ধরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ তা উপস্থাপিত না করায় বিষয়ের উপর পাঠকের সন্দেহাতীত আস্থা আনা সম্ভব নয় বলে আমার মনে হয়। (২) দ্বিতীয় কারণ-ঐ পাঠকের সময়। সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেখে বেদ, উপনিষদ, সাঙ্খ্য, ন্যায়, মহাভারতাদি বিশাল গ্রন্থসমূহ পাঠ করে বিষয়কে দেখে মিলিয়ে নেবার মতো সময় এবং হাতের কাছে এসমস্ত পুস্তক পাওয়া, দুটিই পাঠকের পক্ষে সমস্যা হতে পারে। তাই উদ্ধৃতিগুলো অর্থসহ বিস্তৃতভাবে তুলে দিয়েছি। ...আমার মতো অতি সাধারণের চিন্তাকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে চেয়ে আমাকে শুধু

আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞই করেননি, সমাজহিতৈষী রূপে যে কাজ তাঁরা করে চলেছেন তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

আমি উচ্চশিক্ষিত নই, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় পর্যাপ্ত দখলও নাই, ফলে অনুবাদ গ্রন্থগুলোর উপরই নির্ভর করতে হয়েছে; সেই সঙ্গে আমি যেখানে বাস করি সেখানে ভালো লাইব্রেরীর অভাব যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহের অন্তরায়। সর্বোপরি আমি লেখক তো নয়ই, তাই ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে সে বিষয় অবহিত করলে বাধিত হব। নিজ সনাতন হিন্দু জাতির প্রতি গভীর প্রেম ও নিজ কর্তব্যবোধ থেকে নিসৃত এই পুস্তক সমাজের সামান্যতম উপকারে লাগলে ধন্য হব।

শ্রী প্রীতীশ তালুকদার

ভুমিকা

গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্তই শুধু নয়, এক সময় পূর্বে জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, চম্পাদেশ থেকে পশ্চিমে পারস্য পর্যন্ত সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তার ইতিহাসে প্রমাণিত। সেই হিন্দু সাম্রাজ্য ক্ষয় হতে হতে আজ ভারতবর্ষের খণ্ডিত মানচিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুধু সীমাবদ্ধই নয়, এখানেও হিন্দু জাতির অবক্ষয়ের ধারা এখনও চলছে। তাই সচেতন হিন্দুর মনে আতঙ্ক জাগে, একদিন আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো না তো? এই আশঙ্কা আর অবক্ষয়ের কারণ কি? পরিত্রাণেরইবা উপায় কি? অনেকে বলেন, বিদেশী বিধর্মী শত্রুর বর্বর আক্রমণই এর কারণ। কিন্তু এটাই কী একমাত্র ও শেষ সত্য? খুঁজতে গিয়ে পেলাম এক চরম বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। হিন্দুর সাথে হিন্দুর, নিজ ধর্মের সাথে হিন্দুর, শাস্ত্র-দর্শন ও তার নির্দেশের সাথে হিন্দুর, মনীষী-মহাপুরুষদের সঙ্গে হিন্দুর, দেশ-জাতি-সমাজধর্ম' এর দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে হিন্দুর চরম বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। যে বিশ্বাসঘাতকতা হিন্দুকে আর এই ভারতরাষ্ট্রকে এক ধর্ম, এক জাতি রূপে গড়ে উঠতে তো দেয়ইনি উপরন্তু স্বার্থপরতা, অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, মিথ্যা অহংকার আর ভেদাভেদ দ্বারা হিন্দু নিজেরাই নিজেদের ভিতর থেকে দুর্বল-ভঙ্গুর করে এখনও ক্ষয় করে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে চলেছে।

এ থেকে পরিত্রাণের কি কোনো পথ নাই? জাতি হিসাবে মৃত্যুই কি হিন্দুর ভবিতব্য? পরিত্রাণের উপায়ইবা কি? অক্ষমতা সত্ত্বেও এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কা আর কর্তব্যের তাড়নায় ইতিহাস আর শাস্ত্র-দর্শনাদির প্রমাণের আলোকে আত্মঘাতী হিন্দুর অবক্ষয়ের কারণ, গতি আর উত্তরণের উপায় বিশ্লেষণের প্রয়াস করলাম। আশাকরি এই গ্রন্থ হিন্দুকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে অবক্ষয়ের কারণ, কিছু স্বার্থান্বেষী হিন্দু কর্তৃক সমগ্র হিন্দু জাতিকে প্রতারণার স্বরূপ আর উত্তরণের উপায়।

শ্রী প্রীতীশ তালুকদার

স্বপ্ন ও বাস্তব

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি, বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারতের গভীর জ্ঞান, উদারতা ঐতিহ্য আমাকে গর্বিত করে। এই মহান ধর্ম ও সংস্কৃতির আমিও একজন ধারক ও বাহক, এ আমার অহঙ্কার। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে কেন হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু, হীনবল? হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সগৌরবে অনন্তকাল প্রবাহিত হয়ে এই ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীকে দেখাক প্রকৃত জ্ঞান প্রজ্ঞা ও মানবতার আলোক, সুপ্রাচীন প্রাজ্ঞ সত্যদ্রষ্টা সর্বভূতে মমত্বভাবপূর্ণ ঋষিদের জ্ঞানালোকে চিনুক নিজেদের; থাক বৈচিত্র্য, পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে ঝরে পড়ুক প্রেমাশ্রু, পৃথিবী হয়ে উঠুক ভেদাভেদহীন ভয়হীন সুখের স্বর্গে। এই তো চাই।

কিন্তু বহু ধর্ম সংস্কৃতি ও মতবাদের এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত চলছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা, আর একে অপরকে গ্রাস করার, নিশ্চিহ্ন করার উদগ্র প্রতিযোগিতা। আর সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেও সনাতন হিন্দু জাতি প্রতিযোগিতার বাইরে নয়, বরং অসংবদ্ধ আত্মবিস্মৃত অসচেতন হিন্দু অপর সম্প্রদায়গুলির আগ্রাসনের স্বাভাবিক আহার্য ও লক্ষ। অপরকে গ্রাস করে নিজ কলেবর বৃদ্ধির এবং ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধির স্বাভাবিক লক্ষ্য হিন্দু জাতি ও এই ভারতবর্ষ। 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট'। যোগ্যতমের টিকে থাকার অধিকার আছে। তাই এই আগ্রাসী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেও তাতে হিন্দু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোনোভাবেই এর বাইরে যাবার উপায় নাই। প্রতিযোগিতার ময়দানে একটাই পথ, প্রতিযোগিতা করা। সে প্রতিযোগিতা শুধু অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে নয়, সুদৃঢ় ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন থেকে চিন্তা-ভাবনায় সাযুজ্যহীন হিন্দুর দ্বারা তা সম্ভব নয়; 'বরং অসংগঠিত', স্বধর্ম-স্বজাতী-প্রেমহীন হিন্দুর হারিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। কোনো হিন্দুই তো তা চায় না। হিন্দু হিন্দু হিসাবেই বেঁচে থাকতে চায়। তাহলে কেন হিন্দু পশ্চাদপদ? ক্ষয়িষ্ণু? প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করে তার নিরসনই হিন্দুর উত্থানের প্রকৃত পথ। আলস্য, অদৃষ্টনির্ভরতা লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে না; চাই উদ্যম ও প্রচেষ্টা, পুরুষাকার। কেউ করে দেবে না, আমার কাজ, আমাকেই, আমাদের প্রত্যেককেই সে কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

কেন হিন্দু অপর ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির আগ্রাসনের স্বাভাবিক লক্ষ্য

পৃথিবীতে প্রধান ও বিশাল তিনটি ধর্ম-সম্প্রদায় হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীস্টান। হিন্দু বলে 'সত্য বা ঈশ্বর এক, তার কাছে পৌঁছোনোর অসংখ্য পথ, সব পথেই তার কাছে পৌঁছোনো যায়।' বললেও ইসলাম ও খ্রীস্টান দর্শন তা বলে না। ইসলাম বলে একমাত্র 'আল্লাহ' ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, যারা অবিশ্বাসী তারা সীমা লঙ্ঘনকারী (কাফিরুন)। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। ইসলামই একমাত্র আল্লাহর ধর্ম। জগৎকে ইসলামে পরিণত করাই তাদের উদ্দেশ্য। আমরা দেখেছি পৃথিবীর যেখানেই তারা গেছে ধর্মন্মোত্তের মতো প্রবেশ করেছে; সেখানের কৃষ্টি, সংস্কৃতি,

ধর্ম, ইতিহাস, সব ধ্বংস করে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতেও তাদের প্রবেশ ও অধিপত্যকালের দীর্ঘ ইতিহাস হিন্দুর মন্দির-প্রতিমা ধ্বংস, হিন্দুনারীহরণ-ধর্ষণ, হিন্দু নিধন, ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুর ইসলামিকরণের সাক্ষী দেয়। এখনও চলছে সেই প্রক্রিয়া। খ্রীস্টরাও অপর ধর্মমত স্বীকার করে না। তারাও বলে 'খ্রীস্ট ধর্মই প্রকৃত ধর্ম, খ্রীস্টরাই কেবলমাত্র মুক্তি পাবে, যারা একথা বিশ্বাস করে না তারা ঈশ্বরহীন পশু, তাদের প্রতি বর্ষিত হবে ঈশ্বরের ক্রোধ। তারাও অস্ত্র আর অর্থের বলে বলীয়ান হয়ে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়েছে পৃথিবীতে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় হিন্দুস্থানে তাদের অবদান তিনটি 'ব'; 'বাইবেল, বেয়নেট আর ব্রান্ডি'। এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ই মনে করে সমস্ত পৃথিবীকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করা তাদের কর্তব্য। ইসলাম ও খ্রীস্টান তাদের জন্মলগ্ন থেকেই অপর ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করে ধর্ম-প্রচার ও বিস্তারে নিয়োজিত। ফলে জন্ম থেকে দু-হাজার বৎসরে খ্রীস্টধর্ম ও চৌদ্দশ বৎসরে ইসলাম পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মসম্প্রদায়। উভয় ধর্মসম্প্রদায়ই সু-সংগঠিত। নিজ নিজ ধর্মের প্রচার ও বিস্তার ঘটানো তাদের প্রধান কর্মসূচির অঙ্গ। উভয় ধর্মেই ধর্মপ্রচারকরা সংগঠিত শক্তি ও অর্থের বলে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই ধর্ম বিস্তারে সচেষ্ট। অপর-দিকে হিন্দুজাতি ভেদাভেদপূর্ণ অসংখ্য সম্প্রদায়, উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বিচ্ছিন্ন চিন্তা এ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু জাতি গঠন তো দূরের কথা, তা ভাবার সুযোগ-টুকুও দেয় না। হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটানো অলীক কল্পনা, হিন্দু জাতিকে রক্ষার কথাও হিন্দু ভাবে না। না আছে হিন্দুর প্রচারক, না আছে সংগঠক। সার্বিক হিন্দু জাতির চিন্তার জন্যও কেউ নাই; যারা চিন্তা, করে, কিছু করতে চায়, তাদের কথা হিন্দু শোনে না। আত্মাভিমানহীন, আত্মবিস্মৃত, অসংগঠিত, ক্ষাত্রতেজহীন, অভিভাবকহীন হিন্দু জাতি তাই আগ্রাসী ধর্মাসম্প্রদায়গুলির আগ্রাসন ও ধর্ম বিস্তারের স্বাভাবিক লক্ষ্য। হিন্দুর দুর্বলতার স্থানগুলো খুঁজে নিয়ে হিন্দুকে আঘাত ও হিন্দুর ইসলাম ও খ্রীস্টানীকরণে তৎপর তারা। আর হিন্দু অসহায় সম্মোহিতের মতো অজগরের গ্রাসে বিলুপ্তির পথে।

কারণের সন্ধানে

পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য নয়, বরং সমীহযোগ্য। হিন্দুর দেশ এই ভারতবর্ষ (অন্যরা হয় বহিরাগত নয় ধর্মান্তরিত) খণ্ডিত রূপেও বিশাল, বিজ্ঞান মেধাশক্তি সম্পদ, জনসংখ্যা আদি কোনো দিক থেকেই দুর্বল ছিলোনা, এখনো নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন সভ্যতার আলো থেকে বহু দূরে, তখন এই হিন্দু জাতি শুধু সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিতই হয়নি, সেই সভ্যতার আলো পৌঁছে দিয়েছে পৃথিবীর বহু প্রান্তে। আজ সেই হিন্দু নিজ দেশেও ক্ষয়িষ্ণু, হীনবল, আতঙ্কগ্রস্থ কেন? বিশাল দেশ, বিশাল জনশক্তি নিয়েও হিন্দু ক্ষুদ্র গ্রীক, শক, হুণ, পহ্লব, আরব, মোগল, পাঠান, বৃটিশ দ্বারা শাসিত-শোষিত-লুণ্ঠিত-অত্যাচারিত-ধর্মান্তরিত হয়েছে হাজার বছর ধরে। কেন? পৃথিবীতে খ্রীস্টান, ইসলাম এমনকি ইহুদীরাও সংগঠিত শক্তিরূপে

উঠে আসলেও সংগঠিত হিন্দুশক্তিরূপে হিন্দুর এখনো কেন উত্তরণ হলো না? কোথায় সমস্যা? কোথায় দুর্বলতা? কোথায়? কোথায়? কোথায়?

আমরা বলতে পারি তারা অত্যাচারী, লুণ্ঠনকারী, তস্কর, যুদ্ধবাজ, পরধর্ম আসহিষ্ণু; আর আমরা শান্তিপ্রিয় পরধর্মসহিষ্ণু তাই। কিন্তু শান্তিপ্রিয় পরমর্ধসহিষ্ণুরা কী আত্মরক্ষা করবে না?

এর কারণ আমাদের দুর্বলতা। অভাব আমাদের চেতনায়। দুর্বলতার কারণের মধ্যেই আছে সবল হয়ে ওঠার সূত্র। পরাজয়ের কারণের মধ্যেই আছে অজেয় হয়ে ওঠার মন্ত্র। ভীতির কারণের মধ্যেই আছে ভয়কে জয় করার চাবিকাঠি। সব কাঠে ঘুণ লাগে না, কাঠ যেমন থাকবে, ঘুণ পোকাও থাকবে, কাঠে ঘুণ লাগে সেটা কাঠের দুর্বলতা। যে কাঠ ঘুণে খাওয়ার উপযুক্ত সে কাঠেই ঘুণ লাগে। সেই সম্পদশালী বাড়িই লুণ্ঠিত হয় যে বাড়ির দরজা খোলা থাকে বা সম্পদ রক্ষার জন্য উপযুক্ত নয়, যে বাড়ির মানুষ সজাগ নয় বা যে বাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র সহ সাহসী সাবধাণী পুরুষ নাই। লুটেরা, তস্কর, ধর্ষক ছিলো আছে থাকবেও, হিন্দুকে হিন্দু হয়ে বাঁচতে হলে আগে নিজেদের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে সেই দুর্বলতা দূর করে সংগঠিত শক্তিশালী জাতিরূপে অতিসত্ত্বর তৈরি হতে হবে।

দুর্বলতা কোথায়?

একটু পিছন ফিরে দেখি। যারা উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে দুর্বার গতিতে আমাদের দেশে এসেছে, আমাদের পদানত করেছে, শাসন-শোষণ করেছে, লুণ্ঠন করেছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দুর জীবন ও ধর্ম নাশ করেছে, নারী ধর্ষণ ও লুণ্ঠন করেছে, মন্দির দেববিগ্রহ ধ্বংস করেছে তাদের আমরা প্রতিরোধ করতে পারিনি। তারা কি অপরাজেয় ছিল? তাদের শক্তি-সংখ্যা কুশলতা কি বেশি ছিল? আমরা কি বশ্যতা মেনে নেবার জন্যই বসে ছিলাম?

তারা অপরাজেয় ছিল না। পরাজিত হয়েছে বার বার। রাজা দাহিরের কাছে, পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে। পরাজিত হয়েছে, শক্তি সংগ্রহ করে ফের আক্রমণ করেছে, বার বার। আর আমাদেরই 'জয়চাঁদ' রূপী ছিদ্রপথে আমাদের পরাজিত করে পদানত করেছে। আর বাকি রাজারা দূর থেকে দেখেছে, কেউ বিদেশী বিধর্মী শত্রুকে পরাস্ত করতে একযোগে এগিয়ে আসেনি। আল বেরুণী তাই আশ্চর্য হয়ে লিখেছেন, ''সুলতান মামুদ বার বার আক্রমণ করছে লুঠ করছে, হিন্দুরা যুদ্ধ করছে, হাজারে হাজারে প্রাণ দিচ্ছে, কিন্তু আক্রমণকারী লুঠ করে ফিরে গেলে ফের হিন্দুরা উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। ফের আক্রান্ত হতে পারে, এ ভাবনাই যেন তাদের নাই।" ...''ভারতীয়রা মনে করত, তাদের মতো কোনো দেশ হয় না, জাতি হয় না, ধর্ম হয় না, বিজ্ঞানও হয় না। ...ভারতীয়রা নিজেদের জ্ঞান গোপন রাখতো, এক বর্ণ অপর বর্ণের কাছে। বিদেশীদের কাছেও তারা জ্ঞান গোপন রাখতো।" ...''ভারতীয়রা সবসময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করত।" হিন্দুরা শক্তির অভাবে নিজ ক্ষতি করেনি, করেছে চেতনার অভাবে।

'নাম ও পদবীতে হিন্দু-মুসলমান' গ্রন্থে শ্রী খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক ভারতে হিন্দুর পতনের অনেক কারণের মধ্যে প্রথম কারণ হিসাবে বলেছেন, "...ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র ও রাজত্বের পতন ও অবসানের প্রধান কারণ ব্যক্তিগত সাহস বা শৌর্য-বীর্যের অভাব নয়; সে কারণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও সংঘশক্তির অভাব, এবং তার হেতু অনেক। কৌম চেতনা, আঞ্চলিক চেতনা, সামন্ততন্ত্র, বর্ণবিন্যাসের অসংখ্য স্তরভেদ, সংকীর্ণ স্থানীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি প্রভৃতি...।" ২০০২ খ্রীস্টাব্দে সুলতান মামুদ পেশোয়ারের ছোটো রাজা জয়পালকে যখন পরাজিত করে তখন বাকি হিন্দু রাজারা যদি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতো তবে হয়তো ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্রই থেকে যেত। পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে জয়চাঁদ, রানী দুর্গাবতীর ঈর্ষাকাতর সেনাপতি রানী দুর্গাবতীকে পরাজিত করে, মানসিংহ হিন্দু রাজগণকে পরাজিত করে বিদেশী বিধর্মীর পায়ে উপঢৌকন দিয়েছে। হিন্দুরা শিবাজীর পাশে দাঁড়ায়নি, রানা প্রতাপের পাশে, রানী দুর্গাবতীর পাশে; রাজা প্রতাপরুদ্রের পাশে, এক হিন্দু রাজা অপর হিন্দু রাজার পাশে দাঁড়ায়নি। সম্মিলিত সুলতানী শক্তি বিজয়নগর ধ্বংস করতে পেরেছে, হিন্দু রাজারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। গিয়াসুদ্দিনকে পরাজিত করে হিন্দু রাজা গণেশের উত্থানে মুসলমান মোল্লা, মৌলানা, পীর, দরবেশরা মুসলমান বিদ্রোহ ও আন্দোলন করে হিন্দুরাজার পতন ঘটাতে পেরেছে কিন্তু বিদেশী বিধর্মী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, মান সিংহের মতো হিন্দু বীরেরা ভারতে ইসলামিক রাজত্বের ভিত শক্ত করেছে। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়নবী লিখেছেন, "মুসলিম রাজত্বে সরকারী প্রশাসনে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং নিম্নতর কর্মচারী যুক্ত থাকার ফলে এই বিদেশি শাসন হিন্দুদের কাছে যতদূর বিতৃষ্ণার হবার কথা ছিলো তা হয়নি। কারণ ব্রাহ্মণ মধ্যস্তরা স্বদেশী হিন্দুদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা জানতো...।"

শুধু অনৈক্য নয়, প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাই স্বার্থান্ধ হয়ে মুসলমান রাজত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভারতের মাটিতে। হিন্দুর বিভেদ হিন্দুকে কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ হতে দেয় নি, আজও দেয় না। গ্রীক, শক, হূন হিন্দু সমাজে মিশে যেতে চেয়েছিল। গ্রীকরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেছিল, শক ও হূনেরা ক্ষাত্র অধিকার চেয়েছিল, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাদের স্বীকৃতি দেয়নি। ছোটোজাত-বড়োজাতের মিথ্যা অহমিকায় তাদের ব্রাত্য করে রেখেছিল। এঁরাই মর্যদার স্বার্থে সুলতান মামুদের শরণাপন্ন হয়। মামুদের ঘোষণায় তারা ব্রাহ্মণত্বের অধিকার পায়। ভারতে ইসলাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় এই গ্রীক, শক, হূনদেরই অবদান সর্বাধিক। তাদের হিন্দু সমাজ গ্রহণ করলে রূপটা হয়তো অন্যরকম হতো। এই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হূসেন শাহ হিন্দুর অবজ্ঞা, ঘৃণায় কয়েক লক্ষ্য নাগর ব্রাহ্মণ্য (গ্রীক) ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় (শক, হূন) নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তার পর বাংলায় তাঁর হিন্দু নিগীড়ন, ধর্মান্তকরণ সুবিদিত। যেখানে ইসলাম অপরকে গ্রহণ করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সেখানে হিন্দুর গোঁড়ামী আর ভেদাভেদ হিন্দুকে ক্রমাগত দুর্বল করে গেছে। এই বর্ণ ভেদাভেদ ও গোঁড়ামি এতটাই প্রথিত যে বর্ণ হিন্দুর কাছে সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজের চিন্তা, তাকে রক্ষা করার চিন্তা, তার কাছে তুচ্ছ। তাই হিন্দুর আশার আলো নিয়ে শিবাজী যখন উঠে এসেছেন, তখনও বর্ণহিন্দুব্রাহ্মণ

তার রাজ্যাভিষেকে রাজি নয়। কারণ, মারাঠারা শূদ্র। তাদের কাছে শূদ্র হিন্দু রাজার চেয়ে অত্যাচারী, দেবমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসকারী, হিন্দুর ধর্ম ও জীবন নাশকারী মুসলমান রাজত্বই বেশি গ্রহণযোগ্য হেন।

হিন্দুর ধর্মনেতারা কোনোদিন হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা তো করেইনি, উপরন্তু বর্ণাশ্রমিক উঁচুনিচু ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার দ্বারা হিন্দুকে বিচ্ছিন্ন করে গেছে। বৃহত্তর হিন্দুজাতি থেকে গেছে অবহেলা, অবজ্ঞা অপমানের শিকার হয়ে। স্বামী রামদাস, শিবাজী দেখিয়েছেন অবহেলিত হিন্দুর ঐক্যবদ্ধশক্তির স্ফূরণ। যদি সমস্ত হিন্দু জাতি এক জাতি এক প্রাণ হয়ে গড়ে উঠত তবে আজ এই হিন্দুস্থানের ইতিহাস অন্যরূপ হোত। এটাই আমাদের দুর্বলতা।

কেন হিন্দু সংগঠিত হতে পারে না?

কেন হিন্দু একত্রিত হতে পারে না? কেন হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না? এ এক গভীর মর্মবেদনার জিজ্ঞাসা। এই অনৈক্যের কারণেই সংখ্যগরিষ্ঠ হিন্দু, স্বল্প সংখ্যক অহিন্দুর কাছে মার খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাজনৈতিক দিক থেকেও হিন্দু অবহেলা ও উদাসীনতার শিকার ঐ একই কারণে। রাজনৈতিক নেতা ও সরকারগুলির চিন্তা, তোষামোদ সব সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য। চাকরি, শিক্ষা, অনুদান, ভাতা, এমনকি ধর্মনেতাদের ভাতা তাদেরি জন্য। অপরদিকে তাদের ধর্মোন্মত্ততা, অপর ধর্ম ও ধর্মীয়দের প্রতি আক্রোশ ও আঘাত করার প্রবণতা, দেশদ্রোহিতা, শত্রু বিদেশি শক্তির সাথে একাত্মতা ও এই দেশে জঙ্গী আঘাত করা কোনোটাই তারা দেখতে পায় না। কারণ তাদের ঐক্যবদ্ধ ভোটব্যাঙ্ক। মুসলমানরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানের স্বার্থ দ্বারাই চালিত, যত অপরাধই করুক ভোটব্যাঙ্ক, তাই তাদের অপরাধ অপরাধ নয়। অপরদিকে, হিন্দু ও হিন্দুধর্ম রাজনৈতিক উদাসীনতার শিকার শুধু নয়, তা রাজনৈতিক নেতা ও তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ প্রগতিশীলতার ভেকধারী বুদ্ধিজীবিদের সমালোচনা ও কটাক্ষের মুখরোচক বিষয়। হিন্দু এ কথা জানে, বোঝে। যত হিন্দুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে যত হিন্দুর সঙ্গে বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে এ ধরনের বিষয় এসে পড়েছে, দেখেছি সবাই এ বিষয় অনুভব করে এবং জানে যে, এর কারণ হিন্দুর অনৈক্য। তাদের প্রকাশ বাক্যটা ঠিক এরকম, 'ওদের একতা আছে, হিন্দুদের একতা নাই যে'। এই ভারতবর্ষে হিন্দু ছাড়া আর কোনো ধর্মসম্প্রদায় তো ছিল না। ভারতের মুসলমান ও খ্রীস্টান তো ধর্মান্তরিত হিন্দু। এই হিন্দুই মুসলমান ও খ্রীস্টান হয়ে স্বধর্ম-সচেতন ও সংগঠিত হতে পারে তবে হিন্দু থাকা অবস্থায় বা হিন্দু তা পারে না কেন? কারণ-ইসলাম বা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের পর ঐ সমাজ তাদের মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পেরেছে হিন্দু সমাজ তা পারেনি, বা পারে না।

হিন্দু সব জানে বোঝে, তবুও কেন হয় না? পরিবার, ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র সেই রূপই হয়, যে রূপ সেই পরিবার, ধর্ম, সমাজ, ও রাষ্ট্রের ব্যক্তিবর্গ। আর ব্যক্তি সেই রূপই হয়, যে রূপ চেতনা তার সত্ত্বাগত হয়ে আছে। আমরা প্রত্যেকেই সাধারণ

জীবনে দেখি, পরিবারের কোনো এক ভাই-এর বিপদে অপর ভাইদের ঝাঁপিয়ে পড়তে। সেখানে বোঝাই যাবে না বিপদটা প্রকৃতপক্ষে কার। আবার এও দেখি, অপর ভাইদের উদাসীন থাকতে বা দূর থেকে মজা দেখতে। প্রতিবেশী রূপে সমাজ জীবনেও ঐরূপ দেখি। এর মূলে কাজ করে পরিবার বা সামাজিক ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিরা পরিবার ও সমাজ থেকে কিরূপ চেতনা লাভ করেছে। পরিবার, গ্রাম ও শহর, সমাজ, ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, রাষ্ট্র, সমস্ত কিছুরই মৌলিক উপাদান এক এক জন ব্যক্তি। তাই ব্যক্তি চেতনাই সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। হিন্দুও ঠিক তেমনই, যেমন চেতনা সে হিন্দু সমাজ থেকে পেয়েছে।

বুদ্ধিমান স্বার্থান্বেষী মানুষ ও কপট ধর্ম নেতাদের দ্বারা সাধারণ মানুষের শোষণ সব সমাজেই হয়েছে ও হচ্ছে, আবার বুদ্ধিমান ও ধর্মনেতারাই সেই মানুষের উদ্ধারে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এর মাঝেই ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্ম ও মূলগতভাবে বিভেদহীন সমমর্যাদাপূর্ণ জাতিরূপে নিজেদের প্রকাশ করেছে। ধর্মের জগতে এই দুই ধর্মেই ঐ ধর্মের সকল ব্যক্তিই সকল মসজিদ ও গীর্জায় যাবার, সমানভাবে আরাধনা করবার, ধর্মযাজক হবার সমান অধিকারী। নিজ নিজ ধর্মে তারা সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদার অধিকারী। মৌলানা-ইমামরা, পাদ্রী-পোপেরা নিজ ধর্মের মানুষদের শিখিয়েছে তুমি মুসলমান বা খ্রীস্টান; অপর মুসলমান বা খ্রীস্টানের যে মর্যাদা, যে অধিকার, তোমারও সেই অধিকার; সকল মুসলমান বা সকল খ্রীস্টান একই আল্লাহ বা গড-এর বান্দা বা সন্তান; সবার একই আরাধনা পদ্ধতি, একই ঈশ্বর, একই ধর্মগ্রন্থ, একই পালনীয় কর্তব্য। নিজ ধর্ম পালন ও প্রচার তোমার অবশ্য কর্তব্য। সকল মুসলমান ভাই ভাই, সকল খ্রীস্টান ভাই ভাই, তুমি শুধুমাত্র ইসলাম বা খ্রীস্টান ধর্মেরই একজন নও তুমি এই ধর্মের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক। এ কথা শুধু বলাই হয় নি, এ কথা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে। তাই মিশরে খলিফার পতন হলে ভারতেও হয় মারমুখী আন্দোলন, আফগানিস্থানের মুক্তির জন্য পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশ থেকে আসে মুক্তিযোদ্ধা, প্যালেস্টাইনের জন্য গলা ফাটায় সারা মুসলিম দুনিয়া, আর খ্রীস্টান দেশ বা পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে খ্রীস্টান আক্রান্ত হলে একজোটে ঝাঁপিয়ে পরে সারা খ্রীস্টান দুনিয়া। কারণ তাদের চেতনা এ ভাবেই তৈরি।

আর আমাদের এই হিন্দু জাতি? হিন্দুর বিপদের কথা শুনতেও চায় না। চোখ-কান বন্ধ করে শুধু আতঙ্কিত হয় মনে মনে, গোপনে। তার যে কিছু করণীয় আছে তা মনেও আসে না। মনে পরে শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনের কথা, স্বামী বিবেকানন্দ অনাহুতভাবে যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর সব ধর্ম আহুত, এমনকি ভারতের এই বাংলারই ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ আহুত; কেবল বিশাল হিন্দু জাতি অনাহুত। আমরা অভিমান করে বলতে পারি আমাদের উপেক্ষা করেছে, অপমান করেছে। কিন্তু প্রকৃত কি তাই। কাকে আমন্ত্রণ জানাবে? কে এই হিন্দু জাতির প্রতিনিধি? না আছে কোনো গঠনতন্ত্র, না আছে মান্য ধর্মনেতা। ধর্মনেতার অভাব নাই, ধর্মগুরুর অভাব নাই, জ্ঞানী-বিদ্বান-পণ্ডিতের অভাব নাই তবে তারা শৈব,

শাক্ত, বৈষ্ণব, আদি মতে বিভক্ত; গুরুকেন্দ্রিক নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কারো কাছে কারো গ্রহণযোগ্যতা নাই। নিজেদের হিন্দুরূপে ভাবার সময় নাই। আছে শঙ্করপন্থি, রামানুজ পন্থী, চৈতন্যপন্থী, দাদুপন্থী, মদ্ধপন্থী; কেউ কাউকে গ্রহণ করতে পারে না, সবাই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। আছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; কিন্তু তারা এক অলঙ্ঘনীয় অদৃশ্য প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত। কারো কাছে কারো গ্রাহ্যতা নাই, বর্ণরূপ বিভেদ এদের প্রত্যেককে একে অপরের থেকে বহু দূরের বাসিন্দা করে রেখেছে। সমগ্র হিন্দুর কথা ভাবার কেউ নাই। যেখানে এত বিভেদ, একে অপরের কাছে অগ্রহণীয় সেখানে ঐক্য আসবে কোথা থেকে?

চাই বজ্রকঠিন সংগঠন

যদি খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্মের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো খ্রীস্টানদের গীর্জায় গীর্জায় পাদ্রী আছে। তারা স্থানীয়ভাবে সাধারণ খ্রীস্টানদের সঙ্গে ধর্মনেতা রূপে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক রাখে। এই পাদ্রীরা সাংগঠনিকভাবে দেশের সর্বোচ্চ ধর্মনেতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এবং এরা আন্তর্জাতিক ধর্মনেতা বা পোপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম ধর্মের দিকে তাকালেও দেখব, মসজিদ মাদ্রাসার ইমাম মৌলানারা স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক রেখে চলছে। এই মৌলানারা গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জেলা, রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় ইমামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই ইমামরা আবার আন্তর্জাতিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। এই সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গঠনতান্ত্রিকরূপে সম্পর্কযুক্ত থাকার ফলে এবং বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার ফলে সুসংবদ্ধ ধর্ম-সম্প্রদায় রূপে এই দুই ধর্ম সম্প্রদায় বর্তমান। অপরদিকে হিন্দু জাতির এমন কোনো গঠনতন্ত্র নাই। কোনো এক সময়ে ব্রাহ্মণ ছিল হিন্দুর মস্তিষ্ক। ব্রাহ্মণ আজ বিলুপ্ত। পরবর্তী সময়ে সমাজপতি শাসিত হিন্দু সমাজ ছিল। কিন্তু তারা সংগঠিত করেনি, তারা হিন্দুকে শোষণ করেছে, বিভক্ত করেছে, কুসংস্কার সৃষ্টি করেছে, হিন্দু সমাজের ক্ষয় করেছে। এখন আছে পুরোহিত সমাজ। এরা তো চাল-কলা নিয়েই ব্যস্ত। হিন্দু সমাজের প্রতি এদের কোনো দায় বা দায়িত্ব কিছুই নাই। হিন্দুর পুরোহিতরূপে হিন্দু জাতি বা সমাজের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নাই। শুধু যাজনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক। এদের না আছে শাস্ত্র শিক্ষা, না আছে প্রথাগত শিক্ষা। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এদের একটা সুন্দর চিত্র এঁকেছেন-

'মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে   নগরে যজন করে
        শিখিয়া পূজার আনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে   দেব পূজা ঘরে ঘরে
        চাউলের কোচড়া বান্ধে টানা।।

এমন কোনো মৌলানা ইমাম পাওয়া যাবে না যিনি কোরান-হাদিস পড়েননি বা পড়েন না বা সে বিষয়ে জানেন না, ঐরূপ এমন কোনো পাদ্রী পাওয়া যাবে না যিনি বাইবেল পড়েন না বা জানেন না, অপরপক্ষে এমন কোনো পুরোহিত পাওয়া দুষ্কর যার

শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে। এরা যে সমাজের পুরোহিত সে সমাজের কি-ই-বা হবে। এরা হিন্দুর মস্তিষ্ক নয়, ধর্মনেতা নয়, শুধুমাত্র হিন্দুর জড়তার কারণে এরা যাজন করে যাচ্ছে। হিন্দু মস্তিকহীন বিশালদেহী একটা জাতি হয়ে আছে। হিন্দু যে এখনও টিকে আছে এটা হিন্দুর মহান মহাপুরুষদের অবদান। আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ, মদ্ধাচার্য, মহীদাস, রামদাস থেকে শুরু করে চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত অসংখ্য মনীষী মহাপুরুষরা বার বার হিন্দু জাতিকে জাগরিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করলে হিন্দু জাতি হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যেত।

মহাপুরুষরা চিরকাল হিন্দুকে উদ্ধার করবে আর হিন্দু উদাসীন থাকবে, নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে এটা হতে পারে না। এক এক জন হিন্দুকে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগঠিত ক্ষমতায় মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে। সংঘবদ্ধ জাতিরূপে গঠিত হতে গেলে আগে মিথ্যা ভেদাভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। মিথ্যা ভেদাভেদ হিন্দুর যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে, হিন্দুর অভ্যন্তরীণ কুসংস্কার যে ক্ষতি করেছে তা কোনো বর্হিশক্তিও করতে পারেনি। বর্ণভেদ, অস্পৃস্যতা, কুসংস্কার হিন্দুর ক্ষয় করেছে সবচাইতে বেশি। যে ধর্ম সেই ধর্মের মানুষকেই অস্পৃশ্য অচ্ছুত ছোটোজাত বলে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখে, মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেয় না, শাস্ত্র পাঠের অধিকার দেয় না, জ্ঞান লাভের অধিকার দেয় না, এক হিন্দু অপর হিন্দুর হাতে ঘৃণায় জলগ্রহণও করে না, ভণ্ড বাহ্য ধর্মলক্ষণযুক্ত তথাকথিত হিন্দু সমাজচূড়ামনি তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজপতিরা যে হিন্দুদের কথায় কথায় শাপ-শাপান্ত করে, খড়মপেটা করে; যে সমাজ তার অধিকাংশ মানুষকেই ন্যূনতম মানুষের মর্যাদা দেয় না, সে সমাজের প্রতি তাদের কতটা ভালোবাসা থাকবে? কোন্ মোহে পড়ে থাকবে সে সমাজ আঁকড়ে? স্পর্শদোষ, খাদ্যদোষ, সঙ্গদোষ, গন্ধদোষ, একঘরে, বহিষ্কার যেমন বহু হিন্দুকে স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম বা খ্রীস্টান হতে বাধ্য করেছে তেমনি লক্ষ লক্ষ অবহেলিত হিন্দু সাম্যবাদী ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের মাঝে খুঁজে নিয়েছে মানুষের অধিকার। আজও এই হিন্দু সমাজ প্রায় একইভাবে ধ্বংসের পথে চলেছে। আজও হিন্দু তথাকথিত অবহেলিত হিন্দুদের কাছে টেনে নেয়নি। আজও হিন্দু বামুন পাড়া, কায়েত পাড়া, মাহিষ্য পাড়া, হালদার পাড়া, দাস পাড়া, সাঁওতাল পাড়ায় বিভক্ত হয়ে আছে। বিভেদ দ্বারাই একজন আর একজনকে চিনতে ও চেনাতে চায়-কে কার চেয়ে উঁচু জাত সেটাই তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশিতব্য বিষয়।

মনোমালিন্যে উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণকে 'ছোটোজাত' বলে অসম্মানিত করে উচ্চজাতির অহমিকা প্রকাশই প্রচলিত অভ্যাস। আদিবাসী সর্দার, সাঁওতাল, চামার, মেথরদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের সম্পর্ক তো দূরের কথা, তাদের হিন্দু সমাজের অঙ্গ বলেই ভাবতে চায় না বাকি হিন্দু। উচ্চবর্ণ কর্তৃক দলিতদলন প্রায় প্রাত্যহিক সংবাদের বিষয়। এদের কাছেই তো পৌঁছচ্ছে খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রচারকরা। তাদের ধর্মান্তরিত করছে। উপেক্ষা, অপমান, অমর্যাদার জ্বালা নিয়ে এই ধর্মান্তরিত হিন্দুরাই হয়ে উঠছে হিন্দুর বড় শত্রু। এখনও যদি হিন্দু নিজের ভুল, নিজের দুর্বলতার কারণ খুঁজে না পায়; তা দূর করে সংগঠিত হবার চেষ্টা না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতেই

হিন্দু বিলুপ্ত হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই।

বিভেদ আর ঐক্য দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত শব্দ। তাই বিভেদের অলঙ্ঘনীয় রেখা দ্বারা বণ্টিত থেকে ঐক্যবদ্ধ্য হিন্দু সমাজ 'সোনার পাথরবাটি' তুল্য। তাই সর্বপ্রথম মুছে ফেলতে হবে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ রূপ বিভেদ রেখা। আঁতকে ওঠার কারণ নেই, আমি হিন্দু শাস্ত্র উপেক্ষা করে তা জলাঞ্জলী দেবার কথা বলছি না। সনাতন হিন্দু দর্শন উদার ও মহৎ, সেখানে সংকীর্ণতার স্থান নাই। 'সৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'উদার চরিতানন্তু বসুধৈব কুটুমবকম' যে ধর্মের বাণী, সেখানে বিভেদ থাকতে পারে না। হিন্দুরই একটা শ্রেণী মিথ্যা আহমিকা আর সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে সনাতন হিন্দু জাতিকে দুর্বল, ক্ষয়িষ্ণু করেছে।

হিন্দু জাতির দুর্বলতার কারণ অনৈক্য, অনৈক্যের কারণ ভেদাভেদ

হিন্দু জাতির দুর্বলতার কারণ এক-জাতি-চেতনার অভাব, আর এই চেতনার অভাবের কারণ ভেদাভেদ। হিন্দু জাতির দুর্বলতার কারণ পরস্পরের মধ্যে সমান্তরাল অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর, এই প্রাচীর ভেদাভেদের। আর সকল ভেদাভেদের কারণ বর্ণাশ্রম বিকৃতি, যা এক ধর্ম এক জাতির মানসিকতা হিন্দুর মধ্যে বিকশিত হতে দেয়নি। ধর্মনেতারা ভেদাভেদের অহমিকা আর শ্রেষ্ঠত্ব-নীচত্ব নিয়ে ব্যস্ত থেকে গেছে, তার দ্বারা হিন্দু হিন্দুকেই শুধু দূরে সরিয়ে গেছে, ভেদাভেদ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ঊর্ধ্বে হিন্দু চেতনাকে গঠিত হতে দেয়নি। ইতিহাসও তাই-ই বলে। হিন্দু মনীষী-মহাপুরুষরাও তাই বলেছেন, তাঁরা তার বিরুদ্ধেই লড়াই করে হিন্দুকে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। বর্ণ বিভেদ দূর করে হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ এক জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে 'মানিনা মানব না' 'রূপ ঔদ্ধত্য নয়', বর্ণাশ্রমের উৎস ও প্রকৃত স্বরূপ জেনে সংস্কারিত হতে হবে হিন্দুদের। গতানুগতিকতা নয়, ঔদাসীন্য নয়, স্বার্থান্বেষণ নয়; হিন্দু ধর্ম ও জাতির স্বার্থে, হিন্দুর মুক্তির স্বার্থে প্রকৃত সত্যকে জেনে সত্যাশ্রয়ী, শক্তিশালী হিন্দুজাতি গঠনের স্বার্থে তা করতে হবে। ধর্ম মানে সঙ্কীর্ণতা নয়; সঙ্কীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, বর্ণাশ্রমের প্রচলিত রূপ হিন্দুধর্মের কলঙ্ক ও অভিশাপ; মানবতার কলঙ্ক ও অভিশাপ। সকল জ্বরতা, সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে প্রকৃত সত্যকে অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুকে সচেতন, আত্মাভিমানী হিন্দুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই হিন্দুর উত্তরণ সম্ভব। **হিন্দুর অধোগতির কারণ অনৈক্য, অনৈক্যের কারণ ভেদাভেদ, আর ভেদাভেদের কারণ 'বর্ণাশ্রম'**। এই বর্ণাশ্রমই অভিশাপরূপে নেমে এসেছে হিন্দুর কাছে। তাই হিন্দুর অভিশাপের রূপটাকে প্রথমে জানার চেষ্টা করি।

যে রূপে পাচ্ছি

বর্ণাশ্রম বিষয়ক তথ্য-প্রমাণগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বে বর্তমান হিন্দু সমাজে এর বাস্তব রূপটা একটু দেখে নেওয়া যাক। আমরা হিন্দু সমাজে কিছু মানুষ পাচ্ছি যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। বাকিরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলে পরিচিত। অবশ্য বাঙালি হিন্দুর মধ্যে ক্ষত্রিয় পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈশ্যও পাওয়া যায় না।

(বেনে রূপে অনেকেই অবশ্য নিজের পরিচয় দেয়) শূদ্ররূপে পরিচয় দিতেও দেখা যায় না। অবশ্য নমশূদ্র নামক একটা বর্ণের অস্তিত্ব দেখা যায়। বাকিরা মাহিষ্য, কায়স্থ, হালদার, জেলে, কর্মকার, মুচি, মেথর, ডোম, বাগদি, গোয়ালা, সর্দার ইত্যাদি রূপে নিজেদের পরিচয় দেয়। এগুলো যে অধিকাংশই কৌমগোষ্ঠী তা এই পরিচয় থেকে বোঝা যায়। আবার পঞ্চদশ শতকের স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের বিধান অনুসারে বাংলার ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সবাই শূদ্র। যাই হোক, এই পরিচয়গুলো কিন্তু পুরোপুরি বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ছেলে শূদ্র ইত্যাদি। যেমন, মুর্খ নাস্তিক গুণহীন মদ্যপ চরিত্রহীন ভৃত্য-কর্মচারীও যদি ঐ তথাকথিত ব্রাহ্মণপুত্র হয় তবে সে নিশ্চিতভাবে বর্ণচুড়ামণি সর্ব প্রনম্য ব্রাহ্মণ। আর তথাকথিত শূদ্রপুত্র শিক্ষিত বুদ্ধিমান চরিত্রবান ভক্তিশীল আচারনিষ্ঠ সৎ অধ্যাপক বা বিজ্ঞানী বা সামরিক বিভাগে কর্মরত বা ব্যবসায়ী হয় তবুও সে ঘৃণিত শূদ্র। অর্থাৎ বংশধারাই বর্ণের একমাত্র কারণ। এবং এটাই বিভেদরেখা।

উৎস ও প্রকৃত স্বরূপ খোঁজার আগে কিছু প্রশ্ন জাগে, প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই জাগা উচিৎ। সত্যে পৌঁছোনোর শ্রেষ্ঠ উপায়ইতো জিজ্ঞাসা। জ্ঞাতব্য প্রশ্নগুলো এইরকম—

(ক) বর্ণাশ্রম কী ও কেন? বর্ণের নির্ণায়ক কী?

(খ) এর উৎস, প্রকৃতি ও সার্থকতা কোথায়?

(গ) বংশগতিই কি বর্ণাশ্রম?

(ঘ) বংশগতিই যদি বর্ণের একমাত্র এবং অপরিবর্তনীয় কারণ হয় তবে-ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর বর্ণ আসে কি করে? কারণ স্মৃতি ও পুরাণাদি অনুসারে সকল মানুষ মরীচী, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, প্রচেতস, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, নারদ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ঋষিদের সন্তান। বংশধররূপে আমরা এখনও তাঁদের ও পরবর্তী ঋষিদের নাম 'গোত্র' রূপে বহন করছি ('গোত্র'র অন্য অর্থ অনেকে করে, আমি মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট অনুসরণ করছি)। স্বগোত্র স্ববংশ সমার্থ। হিন্দুর স্ববংশ বিবাহ নিষেধ, তাই স্বগোত্র বিবাহ নিষেধ।

(ঙ) জন্মসূত্রই যদি বর্ণ নির্ণয়ের একমাত্র কারণ হয় তবে মুদগল, গর্গ, ঐতরেয় মহিদাস, মেধাতিথি, সত্যকাম জবাল, কৃপাচার্য, ত্রয্যারুন, চ্যাবন, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ ঋষি হয় কিভাবে? ঋষি অত্রির প্রপৌত্র পুরুরবা, চ্যাবন পৌত্র উপরিচর বসু, কশ্যপ বংশীয় হরিশ্চন্দ্র কিভাবে ক্ষত্রিয় হয়? পুরুরবার চতুর্থ পুরুষ তুর্বসু যবন ও আনু ম্লেচ্ছ; আবার অনু বংশীয় তিতিক্ষু, উশীনর ক্ষত্রিয়, আবার তিতিক্ষু বংশীয় অধিরথ শূদ্র বা বৈশ্য; যদু বংশীয় নন্দ বৈশ্য বা শূদ্র, বৈবস্যৎ মনু পুত্র পৃষদ্ধ্র শূদ্র হয় কি করে?

(চ) ঐতিহাসিক সত্য এই যে, পশ্চিম ভারতের সরস্বতী ও দৃসদ্দি নদীর মধ্যবর্তী স্থলে সনাতন বৈদিক সভ্যতার উদ্ভব। বাকি ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে তা বিস্তারলাভ করে। এমন নয় যে বাকি ভারতের মানুষ, তাদের বংশধর, আর অন্য মানুষ যারা ছিল হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তাহলে ভারতের ঐ বাকি অংশের মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র হলো কিভাবে?

(ছ) খ্রীঃপূঃ পঞ্চম শতকে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পর থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত সময়ে বহু রাজা ও রাজ বংশের সহায়তা নিয়ে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মই ভারতের প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। আচার্য শঙ্করের সময় থেকে সেন যুগের মধ্যবর্তী সময়ে অধিকাংশ বৌদ্ধ হিন্দুধর্মে ফিরে আসে এবং চৈতন্য ও তার পরবর্তী যুগেও হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে। যদি বর্ণাশ্রম বংশগতি হয় তবে তারা হিন্দু ধর্মের চতুর্বর্ণে স্থান পায় কিভাবে?

(জ) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে বাংলায় ছত্রিশ আন্তজ জাতির বাস। ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতয়ের ব্রাহ্মণ অনুসারে বাংলা সংস্কার বর্হিভূত অনার্য ও দস্যুর দেশ। বৌধায়ন ধর্মসূত্র বলছে বাংলা বৈদিক কৃষ্টি ও সংস্কার বর্হিভূত। তাহলে বাংলা চতুর্বর্ণের আশ্রয়ে গেল কি করে?

(ঝ) নার্ডিক, অস্ট্রিক, দিনারিক, নিগ্রোয়েড, আলপয়েড, মোঙ্গোলয়েড প্রভৃতি কোন নৃতাত্ত্বিক বিভাগে কোন বর্ণ পরে? সর্ব বর্ণেই তো সব রকম নৃতাত্ত্বিক গঠন বর্তমান?

(ঞ) বংশধারা যদি বর্ণের একমাত্র বাহক হয় ও তা অপরিবর্তনীয় হয় তবে কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইসলাম বা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রই থাকে নিশ্চয়ই?

(ট) প্রসূতি বিভাগে জন্মের সময় শিশু রদবদল হয়ে গেলেও বৃক্ষচারা একটু বাড়লেই যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু বলে আলাদাভাবে চেনা যায়, তেমনি ঐ শিশুরাও ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররূপে ধরা পরে যাবে নিশ্চয়ই?

যদি বর্ণাশ্রম আবশ্যিক হয়, যদি তা অত্যাবশ্যক হয়, ভেদাভেদ যদি হিন্দুর জাতীয় স্বার্থের চাইতেও বড় হয় তবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া আবশ্যক।

আসুন এবার শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমে প্রবেশ করি।

বিভাজিত বর্ণাশ্রমের সবচাইতে বড় সমর্থক, ধারক ও বাহক তথাকথিত ব্রাহ্মণ বলে যাদের আমরা চিনি বা জানি। শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন (অনেকের কাছে অশুভ বুদ্ধি মনে হতে পারে এবং তখন হয়েছেও) কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে কলকাতায় বৃহৎ বাঙলার ঐরূপ তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজপতিদের সম্মেলনে বর্ণাশ্রম ধর্মের আযৌক্তিকতা এবং কুফল তুলে ধরে এর সমাপ্তির আহ্বান করা হয়েছিল। অধিকাংশের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি।

হিন্দুমহাসভা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল "যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথা চিরন্তন সত্য ও নীতিবিরোধী, যেহেতু ইহা হিন্দু ধর্মের মূল ভাবের বিপরীত, যেহেতু ইহা মানবজাতির সাম্য সম্বন্ধীয় মৌলিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করে...তাই এই নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা এই প্রথার আপসহীন বিরোধিতা ঘোষণা করছে এবং হিন্দু সমাজকে সত্বর এই প্রথা বর্জন করতে আহ্বান করছে।"

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তার 'ধর্ম ও সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "আধ্যাত্মিক

উত্তরাধিকার উন্মুক্ত হওয়া উচিৎ। ব্রাহ্মণত্ব কোনো শ্রেণী নয়, একটা স্বভাব। সবাই তা আয়ত্ত করতে পারে, যদিও ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেও ব্রাহ্মণত্ব হীন হয়। ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে বৃত্তি, শিক্ষা, জন্ম বা লিঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই।"

"হিন্দুধর্ম যদি তার বিজয়শক্তি পুনরুদ্ধার করে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে আমাদের ধর্মীয় চিন্তা ও আচরণ সংস্কৃত করতেই হবে।"

বহু মনীষী, পণ্ডিত, সাধুসন্ত চেষ্টা করেছেন, সম্ভব হয়নি। তাঁদের আমরা ঠাকুর ঘরে রেখে ফুল-বেলপাতায় পূজা করি কিন্তু তাদের জ্ঞান, তাঁদের দর্শন, তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের সাধুতার পূজা আমরা করি না। সে সবের প্রতি এতটুকু সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। এবার বর্ণাশ্রমের বর্তমান বাস্তব রূপটা আগে একটু দেখে নেওয়া যাক।

উৎস ঃ- সনাতন হিন্দু জাতির আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'। চার বেদ, ষড় বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও আরণ্যক, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ নিয়ে বৈদিক শাস্ত্র। হিন্দু বেদের অনুসারী। তাই হিন্দুর আদি পরিচয় বৈদিক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষ সুক্তে'ই বর্ণাশ্রমের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটি এই রকম,-

"ব্রাহ্মণহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত।।"

ঋগ্বেদ, পুঃ সুঃ, ১২

অর্থ ঃ- (বিরাট পুরুষের) মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হতে বৈশ্য এবং পদ হতে শূদ্র জন্মিল। ২য় সূত্র পাই শ্রীশ্রী গীতায়, যা মহাভারতের অংশ। সেটা এইরকম-

"চতুর্বর্ণাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধকর্তারমব্যয়ম।।"

শ্রীগীতা ৪র্থ ১৩

বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্ম বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাকে উহার আকর্তা ও বিকাররহিত জানিও। ৩য় সূত্র পাই মনুস্মৃতিতে-

"লোকনান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়াৎ।।"

মনু, ১ম, ৩১

অর্থ ঃ- (স্রষ্টা) লোক বৃদ্ধির জন্য মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করলেন।

এই তিনটি-ই হচ্ছে আদি উৎস। প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে যে প্রমাণগুলো পেলাম তাতে বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। ঋগ্বেদ ও মনুস্মৃতিতে ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। মুখ থেকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ অঙ্গ থেকে সৃষ্ট তাই ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং অপেক্ষাকৃত নীচ অঙ্গ হতে পর্যায়ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সর্ব নিকৃষ্ট পদ হতে শূদ্র সৃষ্ট তাই নিকৃষ্ট ও নিকৃষ্টতম। এটাই অর্থ করা হয় ও প্রচলিত

ম০। ণণভেদ, বিভেদ, অস্পৃশ্যতার প্রথম ও প্রধান সূত্র। শুধু তাই নয়, এই চতুর্বর্ণ ভাগ্যও অসংখ্য উপবিভাগ, সমস্ত প্রকার ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতার, অনৈক্যের আদি উৎসও এই সূত্রগুলি। প্রমাণ অনুযায়ী বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার যেমন করা যায় না তেমনি প্রশ্ন জাগে, ধর্ম মানে কি অর্থহীন কিছু নিয়ম? ধর্ম মানে কি যৌক্তিকতাবিহীন কিছু আচার-ব্যবহার? ধর্ম মানে কি ভেদাভেদ, মানুষের দ্বারা মানুষের অসম্মান? না, তা হতে পারে না। তবে? বহু মহাত্মা, মনীষী বর্ণাশ্রমের ইতিহাস, উৎস, ঘৃণ্য রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের বিভিন্ন লেখায়। কিন্তু এর শাস্ত্রীয় বিচার-বিশ্লেষণ এখনও সেভাবে হয়নি বোধ হয়, আমি অন্তত দেখিনি। আমি শাস্ত্র দ্বারাই শাস্ত্র-বিধানকে বোঝার চেষ্টা করবো। প্রথমেই প্রশ্ন আসে, বিশাল সনাতন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে তুলে আনা একটা আংশিক ঋক বা একটা শ্লোক দ্বারা কি ঐ ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃত বক্তব্য ও ভাবনার সঠিক প্রকাশ ঘটা সম্ভব? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব নয়, বরং ভুল ব্যাখ্যা হবার সম্ভাবনাই বেশি; বিশেষ করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাকে প্রয়োগ করতে চাইলে তা বিকৃত রূপ গ্রহণ করবে। ''অব্যক্তমব্রবিৎবাক্যম্ হত কুঞ্জর ইত্যতু''র ফলাফল মহাভারতে পরিস্ফুট। তাই জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ দ্বারাই সত্যে পৌঁছনো সম্ভব। অন্ধ ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাসে আবদ্ধ না থেকে সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করি। '...প্রশ্নেন প্রনিপাতেন...' জিজ্ঞাসা ও ভক্তি দ্বারাই জানা, তথা জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। তাই প্রথমেই যে প্রশ্নগুলো আসে তা হল, এই বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মা কে? তার স্বরূপই বা কি? তার শরীর কি আমাদের শরীরের মতোই? তার মুখ, বাহু, ঊরু, পদ-ই বা কেমন? তার মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে কি মাকড়সার সূতো বেরোনোর মতো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের গোটা গোটা মানুষ বেরিয়ে এসেছিল? নানান জিজ্ঞাসা মনে আসে। যারা বলবে অত শত প্রয়োজন কি? সোজা কথায় যা বোঝা যাচ্ছে তাই যথেষ্ট, তাদের জন্য শাস্ত্র নয়। ব্রহ্ম জ্ঞানমূলক, শাস্ত্র জ্ঞানমূলক, তাই জিজ্ঞাসা দ্বারাই তার গভীরে পৌঁছোন সম্ভব। শ্রী শ্রী গীতার বক্তব্য বাহ্যত কিছুটা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বেশিই স্বচ্ছ। গীতায় শ্রী ভগবান বলছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি বর্ণগুলি আমাকর্তৃক সৃষ্ট। এখানে মুখ, বাহু, ঊরু, পদে'র কোনো উল্লেখ নাই, উপরন্তু এটা যে গুণ ও কর্ম বিভাগ সে কথাই বলেছেন। স্বচ্ছত তিনি গুণ ও কর্ম বিভাগকেই বর্ণ বলেছেন। এবার এই উৎস সূত্রগুলো বোঝার চেষ্টা করি।

প্রথমে ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্তের ঐ অংশটুকু বোঝার জন্য আগে গোটা পুরুষ সুক্তটাকে দেখে নেওয়া দরকার। তবে তারও আগে কয়েকটি কথা আছে। হিন্দুর প্রাচীন কোনো গ্রন্থই আমরা পুরোপুরি মৌলিক রূপে পাইনি। শুধু হিন্দুর গ্রন্থই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে 'প্রক্ষিপ্ত' প্রবেশ করেছে। ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্তটিকে পণ্ডিতগণ কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রক্ষিপ্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণগুলি এইরূপ,-

(১) বেদের যুগে বর্ণবিভাগ ছিল না, সমস্ত ঋগ্বেদের আর কোথাও বর্ণের উল্লেখ নাই।

(২) এই পুরুষ সুক্তের ভাষা বেদের বাকি অংশের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

নয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত, বৈদিক সংস্কৃত নয়।

(৩) বৈদিক যুগে বেদ বিভাগ হয়নি। ঋগ্বেদের আর কোথাও বিভাজিত বেদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতের যুগে বেদ বিভাগও সংকলন হয়। পুরুষ সুক্ত অবশ্যই মহাভারত পরবর্তী যুগে কারো দ্বারা রচিত হয়ে ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কারণ এখানে বেদ বিভাজিত। প্রক্ষিপ্ত ও অমৌলিক হলেও এর প্রাচীনত্ব ও অবস্থানগত কারণে একে অস্বীকার করতে পারি না। স্থূল রূপের পিছনে জ্ঞানমূলক যে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে আছে তা আন্বেষণ করব। বাক্যাংশ অর্থ বিকৃত করতে পারে, তাই পুরো সুক্তটা ভালো করে দেখি।

পুরুষ সুক্ত, নারায়ণ ঋষি। ঋক ১ম-

"সহস্রাসীর্ষ পুরুষঃ সহস্রক্ষহ সহস্রপাৎ।

স ভুমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্ততিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম।"

অর্থ ঃ- সেই পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি এই বিশ্বকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করেও দশাঙ্গুলি পরিমাণ আধিক হয়ে অবস্থান করে থাকেন।

ঋক ২য়-

"পুরুষ এবেদং সর্বং যুদ্ধুতং যচ্চ ভব্য।

উতামৃতত্ত্বস্যেশানো যদন্নেনা তিরোহতি।"

অর্থ ঃ- যা হয়েছে বা হবে সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্ব লাভে অধিকারী হন, কারণ তিনি আন্ন দ্বারা আতিরোহন করেন না।

ঋক ৩য়-

"এতাবানস্য মহিমাতোজ্যায়াশ্চ পুরুষঃ।

পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যমৃতং দিবি।।"

অর্থ ঃ-এর এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু এ অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্ববীজসমূহ তার একপাদ মাত্র, অন্তরীক্ষে অমর অংশ তার তিন পাদ।

ঋক ৪র্থ-

"ত্রপাদর্ধ উদেৎ পুরুষ পদোহস্যেহ্বাভবেৎপুনৎ।

ততো বিশ্বঙব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।"

অর্থ ঃ- সেই পুরুষ আপনার তিন পাদ নিয়ে উপরে উঠলেন। চতুর্থ অংশ এখানে রইল। তদন্তর তিনি ভোজনকারি ও ভোজন রহিত (চেতন অচেতন) সকল বস্তুতেই (বস্তুরুপে) ব্যাপ্ত হলেন।

ঋক ৫ম-

"তস্মাদ্বিরাড়জায়তি বিরাজ আধি পুরুষঃ।

স জাত অত্যারিচ্যতপশ্চদ্ভুমিমথ পুরঃ।"

অর্থ ঃ- তিনি হতে বিরাট জন্মিলেন এবং বিরাট হতে সে পুরুষ জন্মিলেন। জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাতে ও পুরবাগে তিনি জগৎকে অতিক্রম করলেন।

ঋক ৬ষ্ঠ-

"য পুরুষেন হবিষা দেবা যঞ্জমতন্বত।

বসন্তঅস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধম শরদ্ধবিঃ।"

অর্থ ঃ- যখন সেই পুরুষকে হব্য রুপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হল, শরৎ হব্য হল।

ঋক ৭ম-

"তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।"

অর্থ ঃ-যিনি সকলের অগ্রে জন্মিলেন সেই পুরুষকে যজ্ঞিয় পশুরূপে সেই বহ্নীতে পূজা দেওয়া হল। দেবতা সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তা দারা যজ্ঞ করলেন।

ঋক ৮ম-

"তস্মাদ্যজ্ঞ্যজ্ঞ্যাত সর্বহুতঃ সমভৃতং পৃষদাজম।

পশুন্তাংশ্চক্রে বায়বানারন্যান গ্রামাশ্চ যে।"

অর্থ ঃ- সেই সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হতে দধি ও ঘৃতের মতো যজ্ঞফল উৎপন্ন হল। বায়ব্য পশুসকল সৃষ্টি হল।

ঋক ৯ম-

"তস্মাদজ্ঞ্যজ্ঞ্যাত সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

চন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মদ্যহস্তস্মাদজায়তি।"

অর্থ ঃ-সেই সর্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হতে ঋক ও সাম সমূহ উৎপন্ন হল, ছন্দ সকল তথা হতে আবির্ভূত হল, যজু তা হতে জন্মগ্রহণ করল।

ঋক ১০ম-

"তস্মাদস্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।

গাবো হ যজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজাতাঅজাবয়ঃ।।"

অর্থ ঃ- ঘোটকগণ, অন্যান্য দন্তপংতিধারী পশুগণ জন্মিল। তা হতে গাভি, মহিষ ও ছাগগণ জন্মিল।

ঋক ১১-

"যৎপুরুষৎ ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।

মখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্চেতে।।"

অর্থ ঃ- পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল, কয় খণ্ড করা হয়েছিল? তার মুখ, বাহু, উরু, পদ কি হল?

ঋক ১২-

"চন্দ্রমা মনোসো জাতশ্চক্ষৎ সূর্য অজায়ত।

মুখান্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রনাদ্বায়ুরজায়তে।।"

অর্থ ঃ- চন্দ্র হতে মন, চক্ষু হতে সূর্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি ও প্রাণ হতে বায়ু এবং ১৪নং ঋকে নাভি হতে আকাশ, মস্তক হতে স্বর্গ, দু চরণ হতে ভূমি ও কর্ণ হতে দিক ও ভুবন সৃষ্টি হলো।

বিরাট পুরুষ হতে যে পুরুষ জন্মিলেন, যাকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হল, যার মুখ, বাহু, উরু, পদ হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রই শুধু জন্মিল না সমগ্র ভূমি

অর্থাৎ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, আকাশ সৃষ্টি হল, যিনি জন্মেই আকারে জগতকে অতিক্রম করেছিলেন, তিনি কেমন পুরুষ? জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই যজ্ঞ করার জন্য দেবতা, ঋষি ও সাধ্যগণ কোথা থেকে এলো? ভূমি সৃষ্টির পূর্বে যজ্ঞবেদি কোথায় হল? অগ্নি সৃষ্টির পূর্বে কোন্ অগ্নিতে তাকে আহুতি দেওয়া হল? আর ক্রমানুসারে দেখলে চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ, ভূমি, দিকসমূহ ও ভুবন সৃষ্টির পূর্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টি হলো কী করে?

এই প্রশ্নগুলোকে উপেক্ষা করে স্থূল অর্থে শুধু মুখ, বাহু, ঊরু, পদ হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সৃষ্টির তত্ত্ব খাড়া করলে তা হবে প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে। আর পুরো সুক্তে যেখানে কোনো প্রশ্ন নাই সেখানে ১১ নং ঋকে হঠাৎই নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র মুখ, বাহু, ঊরু, পদ কি হল প্রশ্ন করাটা সন্দেহের উদ্রেক করে। এটাও মনে রাখতে হবে, এই সুক্তের অমৌলিকতা পণ্ডিত সমাজে গৃহীত। আর একটি মোক্ষম প্রশ্ন এখানে আসে, আর সেটা হলো—ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু, পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, এ ছাড়া অপর মানুষ সৃষ্টির কথা নাই। সেই অর্থে যদি মানুষ এই চতুর্বর্ণ রূপেই সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে চতুর্বর্ণের বাইরে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। গোটা এশিয়া মহাদেশটায় চর্তুবর্ণ রূপে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ধরে নিলেও বাকি মহাদেশগুলোতে মানুযের কোনো অস্তিত্ব নাই মানতে হয়। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের বর্ণনায় বলা হয়েছে, হিমালয় থেকে ইন্দু সরোবর বা হিন্দু মহাসাগর পর্যন্ত যে দেশ তাই ভারতবর্ষ নামে কথিত, এর পশ্চিমে যবন দেশ ও পূর্বে কিরাত দেশ। একমাত্র ভারতবর্ষই কর্মভূমি, এখানেই কর্মের বিভাজন আছে এবং মানুয ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণাশ্রমের আশ্রয়ে নিজ নিজ কর্ম করে। জগতের আর কোথাও কর্ম বিভাজন নাই। মনুস্মৃতিও ওইরূপ বলছে। এখন যদি ঐ পুরুষ সুক্ত ও মনুস্মৃতির সূত্র ধরে নিয়ে বলি যে, বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হতে এই সমস্ত জগৎ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র রূপ মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিষ্ণুপুরাণ ও মনুস্মৃতির সূত্র ধরে বলি একমাত্র ভারতবর্ষেই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে ও আছে তবে ভারতবর্ষের বাইরে আর কোথাও মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কেউ বলতে পারেন ভারতবর্ষ থেকেই সারা পৃথিবীতে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু শুধু ভারতবর্ষেই মানুষ সৃষ্টি হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এ যুক্তি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে সিদ্ধ হয় না। নৃতাত্বিক প্রমাণের দিক থেকেও নয়। শাস্ত্রগ্রন্থাদি অনুসারেও এমন কোনো প্রমাণ নাই। বরং উল্টোটাই আছে।

‘‘পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
পারদঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদঃ খশঃ।।
মুখবাহুরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।।” মনু ১০ ৪৪

এখানে পরিষ্কার বলছে, পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ, এরা মুখ, বাহু, ঊরু, পদ হতে জাত নয়। এদের

মধ্যে পৌণ্ড্রক, ঔণ্ড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ তো আবার ভারতীয় জাতি। তাহলে এটাই কি সিদ্ধান্ত হয় যে, এই শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো পরস্পর বিরুদ্ধ, স্ববিরুদ্ধ, ভ্রান্তিমূলক, মনগড়া তথ্য দ্বারা পূর্ণ? না, তাও নয়। কেন ও কিভাবে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। তবে এখানে থেকে এটুকু বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল সমন্বিত এই জগৎ যদি মোটামুটি একই সময়ে বা যে ক্রম সূত্রে দেওয়া আছে সে ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণচতুষ্টয় মানুষ নয়, বিস্তৃত যাবার আগে মনুস্মৃতির সূত্রটার আগে পরে কি আছে দেখে নেওয়া যাক। মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের ৩১নং শ্লোকে স্রষ্টার মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

তারপর ৩২ নং শ্লোক- "দ্বিধা কৃত্বাত্মানো দেহমর্ধেন পুরুষোহভবেৎ।
অর্ধেন নারীতস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভু।।"

অর্থ ঃ-নিজ দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করে অর্ধভাগে পুরুষ ও অর্ধভাগে নারী হলেন এবং তাতে বিরাটপুরুষ সৃষ্টি করলেন।

৩৩ নং শ্লোক- "তপস্তপত্বাসৃদজন্তু সস্বয়ং পুরুষ বিরাট।
তং মাগ বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ।।"

অর্থ ঃ- হে দ্বিজগণ, সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করে যাকে সৃষ্টি করলেন সকলের স্রষ্টা আমিই (মনু)সে।

৩৪ নং শ্লোক- "অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষন্তু তপস্তপত্বাসুদুশ্চরম।
পতীন প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ।।"

অর্থ ঃ- আমি লোক সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা প্রথমে দশজন প্রজাপতি মহর্ষীকে সৃষ্টি করলাম।

৩৫ নং শ্লোক- "মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুম।
প্রচেতসং বশিষ্টশ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।।"

অর্থ ঃ- এরা হলেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, প্রচেতস, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, নারদ।

৩৬ নং শ্লোক- "এতে মনুংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চমিতৌজসঃ।।"

অর্থ ঃ- এরা অতি তেজসম্পন্ন অন্য সাত মনুকে, দেবতাগণকে, দেবগণের বাসস্থান ও অপরিমিত বলশালী মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করলেন। এর পরবর্তী শ্লোকগুলোতে জাগতিক সৃষ্টি শুরু হল।

এখানেও দেখতে পাচ্ছি মানুষ সৃষ্টি তো দূরের কথা, জগতের সৃষ্টিকর্তা ঋষিগণ, তাঁদেরও সৃষ্টিকর্তা ঋষিগণ, তাঁদের সৃষ্টিকর্তা বিরাটপুরুষের সৃষ্টির পূর্বেই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রামাণ্য সূত্র থেকে এটুকু অন্তত মনে হয় না কি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্বশরীরে ভগবানের মুখ, বাহু, ঊরু, পদ থেকে নির্গত হয়নি। এবার দেখা যাক ঐ বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মাকে, যজ্ঞ কি, দেবতা কারা, বিরাট পুরুষের যে শরীর হতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হল, যাকে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে বলী দেওয়া হলো,

যার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হতে চার বর্ণের উৎপত্তি হলো, তিনি কেমন? তিনি কী আমাদের মতোই শরীর ধারী? যিনি জন্মেই জগৎকে অতিক্রম করেন, যার থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হল, তিনি যে সাধারণ পুরুষ নন এটা সবাই বুঝতে পারে। তাহলে তিনি কেমন?

তার আগে দেখা প্রয়োজন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, যার থেকে এই জগৎ ও জীব সহ সকল কিছু সৃষ্টি তিনি কেমন।

''যোহসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মহব্যক্তহ সনাতনঃ।

সর্বভূতময়োহচিন্তঃ...।''

ইন্দ্রিয়ের আগোচর, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, শাশ্বত, অচিন্তনীয়, সর্বভূতময় (সকল সৃষ্টিভূতে যিনি ব্যাপ্ত)। ''অমাত্রচতুর্থোহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত এবমোস্কার আত্মৈব।'' অর্থাৎ, মাত্রা শূন্য, তুরীয়, অব্যবহার্য, বিষয়প্রপঞ্চের অতীত, মঙ্গলময়, অদ্বৈত। এই হচ্ছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের রূপ। তাহলে এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেমন ছিলো?

''আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতলক্ষনম্।

আপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।।''

অর্থাৎ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপ্রজ্ঞাত, লক্ষণহীন, অননুমেয়, অবিজ্ঞেয় ও সুসুপ্ত। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ও জগৎ বাক্য, মন ও বুদ্ধির অতীত। আর এখান থেকেই শুরু ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম।

''ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।।''

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপ্রতিহত শক্তিসম্পন্ন তমোনুদ ভগবান স্বয়ম মহাভূতাদি রূপে আবির্ভূত হলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চমহাভূত রূপেই ব্রহ্মের প্রথম স্থুল প্রকাশ। জীব ও জ্বর সমৃদ্ধ সমগ্র জগৎ এই পঞ্চ মহাভূত ও তাদের গুণ রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ দ্বারাই সৃষ্ট। মণ্ডুক্য উপনিষদ বলছে- ''সর্বং হ্যেতদ ব্রহ্ম, অয়মাত্ম ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুস্পাত।'' অর্থাৎ এই সকল কিছুই ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম, এই আত্মা বা ব্রহ্ম চারি-পদ-বিশিষ্ট।

অর্থাৎ সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের চারটি অবস্থা। বৈশ্বনর বা বিরাট, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। 'বিরাট' কেমন?

''জাগরিতস্থনো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তঙ্গ একনবিংশতিমুখঃ

স্থুলভূগবৈশ্বানরঃ প্রথম পাদ।।''

অর্থাৎ, ব্রহ্মের যে অবস্থা বহিঃবিশ্বের জ্ঞাতা বা ব্রহ্ম যে অবস্থায় বহিঃজগৎ রূপে প্রকটিত; সাতটি যার অঙ্গ, (যথা, দ্যুলোক মস্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, জল মূত্রাশয় ও পৃথিবী পদ।) উনিশটি মুখ (যথা-পাঁচ প্রাণ, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রীয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রীয়, চার অন্তকরণ) বা উপলব্ধিদ্বার ও যিনি স্থূলবিষয় ভোগ করেন, সেই বিশ্বরূপ (বিশ্বই যার রূপ) বা বিরাট পুরুষ প্রথম পাদ। অর্থাৎ এই স্থুল ও সূক্ষ্ম বিশ্বই বিরাট পুরুষ।

''ক্লেসকর্মবিপকাশয়ৈরপরামৃষ্ঠঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।।''

পাতঞ্জল ১/২৪

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কহীন ঈশ্বরই পুরুষ। চরকসংহিতায় এই পুরুষকে এক ধাতু, ষড়ধাতু ও চতুবিংশতিক ধাতু বলা হয়েছে।

''চেতনাধাতুরপোকঃ স্মৃতঃ পুরুষসঙ্গকঃ" চরক-শারীর-১/১৬

সমস্ত ধাতু বা তত্ত্বের মধ্যে যিনি চেতনা তিনিই পুরুষ।

আবার ''পুনশ্চ ধাতুভেদেন চতুর্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ।

মনো দশেন্দ্রিয়াণার্থাঃ প্রকৃতিশ্চাষ্টধাতুকী।।" চরক/শারীর/১/১৭

চব্বিশ ধাতু বা তত্ত্বে অবস্থান হেতু সেই পুরুষই চব্বিশ।

মহাভারত বলছে,-

''নব-দ্বারং পুরং পুণ্যমেতৈর্ভাবৈঃসমন্বিতম্

ব্যাপ্য শেতে মহানাত্মা তস্মাৎ ওউরুষ উচ্যতে।।" মহা ১২/২০৩/৩৫

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত বুদ্ধি, মন, দেহ, প্রাণ, সত্ত্বাদি গুণ তত্ত্ব সমন্বিত নব দ্বার যুক্ত পবিত্র পুরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন যিনি তিনি পুরুষ। গীতায় পুরুষ ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি।

''প্রকৃতি পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানাদী উভাপতি।।" গীতা/১৩/২০

মণ্ডুক উপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে সৃষ্টিতত্ত্ব ও যজ্ঞের রূপকতার সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণেও এই যজ্ঞ ও সৃষ্টির বর্ণনা আছে। সেখানে ব্রাহ্ম'ই ব্রহ্মণ। তিনি বহু হতে চেয়ে প্রথমে ক্ষত্রিয় হলেন কিন্তু তা দ্বারা সৃষ্টি হলো না, তিনি বৈশ্য হলেন কিন্তু তাতেও সৃষ্টি হলোনা, এবার তিনি শূদ্র হলেন। তারপর তিনি ধর্ম ও অপর সমস্ত কিছু হলেন। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ ও গুণে বিভক্ত হয়ে এই জগৎ সৃষ্ট। কর্ম বা প্রক্রিয়াই যজ্ঞ, যার দ্বারা জগৎ পোষিত তাহাই পষু, রূপকার্থে পশু। সেই অশ্ব যা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হলো তা চতুস্পদ ঘোড়া নয়, 'অশ্বত' অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাই তিনি অশ্ব। পুরুষ অর্থে পুরুষ মানুষ নয়, 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ' তিনি পূর্বে আত্মা রূপে আসীত অর্থাৎ অপরিদৃশ্যমান; বাক্য, মন ও বুদ্ধির অতীত ছিলেন তাই 'পূর্বঃ ঔষৎ' কারণে তিনি 'পুরুষ'। বৈদিক শাস্ত্রে দেবতা তেত্রিশ জন; একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু এবং ইন্দ্র (অশনী)। ও প্রজাপতি (যজ্ঞ); এবং এই তেত্রিশ দেবতা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ। অর্থাৎ ব্রহ্মই দেবতা। 'যদ বাক্যং স ঋষি' অর্থাৎ এই ঋষিও ব্রহ্ম। এ থেকে এটাই পাওয়া যায় যে এক ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে বহুভাবে বিকশিত করেছেন।

''ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীদমেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছেয়ো রূপমত্যসৃজৎ ক্ষত্রং যান্নেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্র বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্যন্য যমো মৃত্যুরিশান ইতি।" বৃহঃ উপঃ ১ম, ৪র্থ ব্রাঃ ১১

একরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণে প্রথমে ক্ষত্রিয়রূপে ব্যক্ত হলেন। এই ক্ষত্রিয়রা হলেন বরুণ, রুদ্র, সোম, পর্যন্য, যম, মৃত্যু, অশনী। তারপর

''স নৈব ব্যভবৎ স বিশ্বমশৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গনশ

আক্ষায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বদেবা মরুত ইতি।।" ঐ ১২

বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, মরুত আদি বৈশ্য সৃষ্টি করলেন।

তারপর,

"স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজৎ পুষণমিয়ং বৈ পুষেয়াং

হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিংচ।। ঐ ১৩

এবার তিনি পুষনরূপী শূদ্রজাতি সৃষ্টি করলেন। এই পৃথিবীই শূদ্র। যাহাকিছু আছে তা এই পৃথিবী দ্বারাই পোষিত, তাই পৃথিবীর অপর নাম পূষা।

এখান থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণগুলি যে গুণ ও কর্ম এবং সেই গুণ ও কর্ম রূপে র্নিগুণ ঈশ্বর নিজেই প্রকাশিত তা পরিস্ফুট। **প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের পুরুষসুক্ত ও মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের যে অংশকে হিন্দু বিভেদ, বিভাজন ও অনৈক্যের কারণ করে তুলেছে তা প্রকৃতপক্ষে জাগতিক সৃষ্টির সূত্রাকার বর্ণনা।**

ঈশ্বরের দুটি রূপ, স্বগুণ ও র্নিগুণ। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম যখন র্নিগুণ তখন জগৎ অস্তিত্বহীন, তার স্বগুণ সত্ত্বা র্নিগুণ সত্ত্বায় বিলীন। সেই গুণাতীত ব্রহ্মের 'বিকৃতি' হলো 'আমিত্ব' বা 'অহঙ্কার'। এই অহঙ্কারাত্মক বিকৃতি থেকে গুণাতীত ব্রহ্ম হতে সৃষ্ট হলো স্বগুণ ব্রহ্ম, যা 'মহৎ' নামে প্রসিদ্ধ। মহৎ হতে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসীক অহঙ্কার উৎপন্ন। ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার হতে উৎপন্ন পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রীয়। এই পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, একাদশ ইন্দ্রীয়, অহঙ্কার, মহৎ ও স্বগুণব্রহ্ম বা পুরুষ নিজে, এই চব্বিশ তত্ত্ব দ্বারাই জগৎ তথা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট। সাংখ্য দর্শন ২৫টি, পতঞ্জলির যোগ ২৬টি, চরক সংহিতা ২৪টি, যাজ্ঞবল্ক সংহিতা ২৪টি, মহাভারত স্থান বিশেষে ২৩, ২৪, ২৫টি, গীতা ৮টি, ভাগবৎ ব্রহ্মকেই একমাত্র মূলগত তত্ত্ব বলেও অন্যত্র ২৪টি তত্ত্বের উল্লেখ করেছে। মনু সংহিতা ২৪টি তত্ত্বের কথা বলেছে। সংখ্যাগত দিক থেকে আলাদা আলাদা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সংখ্যার বৈষম্যের কারণ একটি তত্ত্বের মধ্যে আর একটি তত্ত্বের অবস্থান ও একটি তত্ত্ব থেকে আলাদা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সংখ্যার বৈষম্যের কারণ একটি তত্ত্বের মধ্য আর একটি তত্ত্বের অবস্থান ও একটি তত্ত্ব থেকে আলাদাভাবে আর একটি তত্ত্বকে নিষ্কাশন। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখ নাই। শুধু এটুকু ছাড়লে সর্বত্র এই তত্ত্বগুলিই জগৎ সৃষ্টির কারণরূপে উল্লিখিত। বেদান্তও একই কথা বলে। ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার হতে উৎপন্ন পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত একাদশ ইন্দ্রীয়ে ব্যাপ্ত আছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার। অর্থাৎ এই তত্ত্বগুলো ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতির সর্বত্র তিন গুণের অবস্থান ও তারতম্য হেতু প্রকৃতি চতুষ্পাদ (ঋক. পু. সু. ৩), (মাণ্ডুক্য. ২)। মাণ্ডুক্য মতে তুরীয়, প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর, এই চারটি চতুষ্পাদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণে প্রথমে বরুণ, রুদ্র, সোম, পর্যন্য, যম, মৃত্যু অশনি রূপ ক্ষত্রিয় হলেন। তারপর বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, মরুৎ আদি বৈশ্য, এবং এই পৃথিবীরূপ শূদ্র হলেন। এই তুরীয়, প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর, এবং ব্রহ্ম, বরুণ, রুদ্র, সোম, পর্যন্যআদি; বসু , আদিত্য, বিশ্বদেবাদি ও পৃথিবীই পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এগুলি দ্বারা গুণ ও কর্মকেই নির্দেশ করে। অতিজাগতিক ক্ষেত্রে স্থূল জগৎ শূদ্র হলেও এ জগতও গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু চতুর্বর্ণে বিভক্ত। জীবজগৎ, মানবজগৎ সহ সমস্ত কিছুই ঐভাবে বিভক্ত। আলাদা আলাদা সরলরেখায় বিভক্ত হয়ে চতুর্বর্ণের মানুষ জগতে অবতীর্ণ হয়নি। ক্ষুভিত তত্ত্বাদি হতে তন্মাত্র উৎপন্ন। শব্দতন্মত্র হতে আকাশ সৃষ্ট; তত্ত্বাদি দ্বারা আকাশ ক্ষুভিত হয়ে স্পর্শ তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হতে বায়ু; বায়ু ক্ষুভিত হয়ে রূপ তন্মত্র এবং তা হতে জ্যোতি; জ্যোতি ক্ষুভিত হয়ে রস তন্মাত্র, এবং তা হতে জল; জল ক্ষুভিত হয়ে গন্ধ তন্মাত্র, এবং তা হতে পৃথিবী (পৃথিবী অর্থে যে পৃথিবী আমরা বুঝি তা নয়, পঞ্চমহাভূতের সবচাইতে স্থূল উপাদান। অর্থাৎ এই পৃথিবী গঠনের বায়ু, জল, আকাশ, জ্যোতি ছাড়া যে সূক্ষ উপাদান তাই এই পৃথিবী) উৎপন্ন। এদের গুণও শান্ত, ঘোর ও মূঢ় বা স্বাত্বিক, রাজস ও তামস। বিপরীত গুণবিশিষ্ট এই পঞ্চ মহাভূত ও অপরাপর তত্ত্বসমূহ পরস্পর সংঘাতজনিত হয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় আকার গ্রহণ করে। ক্রমে সেই কণা তত্ত্বসমূহকে আকর্ষণ ও নিজদেহে সন্নিবেশিত করে স্ফীত হতে থাকে। একেই অণ্ড বলা হয়েছে। স্ফীত এই অণ্ড বিস্ফোটিত হয়ে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি সহ এই জগৎ সৃষ্ট। মানুষের আবির্ভাব অনেক পরে। গুণাতীত ব্রহ্ম হতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হতে তত্ত্বসমূহ, এবং তত্ত্বসমূহ দ্বারাই মানুষ সৃষ্ট তাই মানুষের মধ্যেও গুণগুলির অবস্থান ও প্রকাশ ঘটে। গুণগুলির একটির অপর দুটিকে অভিভূত করে প্রবল হওয়ার দ্বারাই বিশেষ বিশেষ গুণের প্রকাশ ঘটে। এই গুণপ্রকাশ বৈষম্যই চতুর্বর্ণ।

হিন্দু দর্শনের প্রায় প্রতি স্থলেই রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সূক্ষ্ণ বিষয় প্রকাশের ও বোঝানোর সুবিধার জন্য স্থূল উপমা ছাড়া উপায়ও নাই। সেই উপমার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ণে পৌছনোই জ্ঞান আহরণকারীর উপায়। মনুস্মৃতিতেও এই বিরাট পুরুষকে শরীররূপে কেন বর্ণনা করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"যন্মুর্ত্যবয়বাঃ সূক্ষস্তসেমান্যশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্তিং মনীষিনাঃ।।"

অর্থাৎ- যে হেতু শরীর সম্পাদক ছয়টি সূক্ষ্ণ অবয়ব (অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, বর্ণ, স্পর্শ) আশ্রয় করেন, তাই মনীষীগণ ব্রহ্মার মূর্তিকে শরীর বলেন। এই বাক্য দ্বারাই পরিস্ফুট যে, তা স্থূল অর্থাৎ সাধারণ মানুষ শরীর বলতে যা বোঝেন তা নয়। আর একটা শব্দ এখানে আছে, সেটা 'মূর্তি'। মূর্তি কী?

"ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।।"

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপ্রতিহত শক্তিসম্পন্ন তমোনুদ ভগবান স্বয়ম্ মহাভূতাদি রূপে আভির্ভূত হলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও তার গুণ রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ গুণহীনের গুণরূপে প্রকাশই মূর্ত হওয়া। যাহা মূর্ত তাহাই মূর্তি। ব্রহ্ম শাশ্বত, সনাতন।

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রহ্যমগোত্রমবর্ণম্

অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপানিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসুক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভুতযোনিং...”

অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, কারণহীন, রূপহীন, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত, পদ ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয় বর্জিত, অবিনাশী, ব্যাপক, সর্বভূতগত, অতিসূক্ষ্ম, সর্বভূতসমূহের উৎপত্তির কারণ অক্ষর ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের সৃষ্টি-লোপ, বৃদ্ধি-ক্ষয় গুণযুক্ত যে আবির্ভাব তা মৃত্যুশীল, তাই এই মৃত্যুশীল মর্ত রূপ তার মূর্তি। অর্থাৎ এই জগৎই তার মূর্তি। তাই, স্থূল শরীর গঠনকারী উপাদান রূপ এই জগৎ যে হেতু বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মা, তাই স্থূল শব্দে তা উপমায় শরীর।

এখন এই জগৎটাই ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষ হলে অর্থাৎ এই জগৎই তাঁর শরীর হলে তাঁর মুখ, বাহু, ঊরু, পদ কী? প্রতীকি বা উপমা শরীরের এই মুখ, বাহু, ঊরু, পদও প্রতীকি। মুখ অর্থে উপলব্ধিদ্বার আগেই দেখলাম। উপলব্ধি অর্থ জ্ঞান। সেই অর্থে জ্ঞানই ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের ১২ ঋকে মুখ, বাহু, ঊরু পদ হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, পরের ১৩ ঋকে আবার মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অগ্নি অর্থাৎ জ্যোতি, জ্ঞানও জ্যোতি; বেদ অর্থও জ্ঞান, যে যজ্ঞ হতে চর্তুবর্ণ সৃষ্টি হলো সেই যজ্ঞ হতেই চর্তুবেদও সৃষ্টি হলো। আবার এই বেদ সূর্য হতে দোহন করা হয়েছে। বেদে সূর্য ও অগ্নি সমার্থক। সূর্য ও অগ্নি অর্থ জ্যোতি, প্রকাশ, আবার জ্ঞানও জ্যোতি, প্রকাশ, আবার বেদ অর্থও জ্ঞান। অর্থাৎ মুখ হচ্ছে উপলব্ধি দ্বার, উপলব্ধি দ্বার দ্বারা যা উপলব্ধ ও বহির্গত হয় তা জ্ঞান, সেই অর্থে জ্ঞানই ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদে ইন্দ্র ত্রাতা ও বৃষ্টির দেবতা পোষণকর্তা। সেই অর্থে জগতের ত্রাণ ও পোষণকারি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ। পদ বা চরণ ব্যক্তিকে ধারণ ও বহন করে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে ও মনুস্মৃতিতে বিরাট পুরুষের চরণ হতে বা চরণ শূদ্র হল, আবার পুরুষ সুক্তে সেই পদ ভূমি হোলো। ভূমি হল ধারক, উৎপাদক। ভূমির ধারণেই জগৎ স্থিত ও ভূমিজাত দ্বারা পরিপোষিত। অর্থাৎ, ধারণ ও উৎপাদন গুণই শুদ্র। ঐরূপ বাহু বল-বীর্যের এবং ঊরু উদ্যম ও কামের প্রতীক। এই প্রতীক বা রূপকের একটা উদাহরণ দিই,

“মনষীন্দং দশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যাগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজননে চ প্রজাপ্রতিম্।।” মনু ১২ ১২১

অর্থাৎ, মনে চন্দ্র, কানে দিকসমূহ, পদে বিষ্ণু, বলে শিব, বাক্যে অগ্নি, গুহ্যদ্বারে সূর্য, জননাঙ্গে প্রজাপতির অবস্থান। আশাকরি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, এ থেকে উপমা রূপটা পরিষ্কার হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে সৃষ্টিকালের অপরাপর সৃষ্টির মতোই সৃষ্ট গুণ তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এবার শ্রীশ্রী গীতার বক্তব্যটা দেখা যাক। গীতায় শ্রী ভগবান বলছেন, “চর্তুবর্ণাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগসঃ।”

অর্থাৎ, চারটে বর্ণ আমাকর্তৃক সৃষ্ট, যা গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে হয়েছে।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, চতুর্বর্ণ প্রকৃতপক্ষে গুণ ও কর্মের বিভাগ। এর পূর্বে দেখেছি ব্রহ্ম নির্গুণ বা গুণাতীত। গুণাতীত ব্রহ্মই সৃষ্টির জন্য স্বগুণ রূপে নিজেকে

প্রকাশ করলেন। এখন এই গুণ কি?

"মম যোনোর্মহদব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।" গীতা ১৪শ।৩

হে ভারত, মহৎ নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহাতে আমি গর্ভাধান করি। সেই গর্ভাধান হতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্ট হয়।

"সত্বং রজস্তম্ ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবন্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।" গীতা ১৪শ ।৫

হে মহাবাহো, আমার প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ-এই গুণত্রয় পরমার্থতঃ নিষ্ক্রিয় আত্মাকে দেহাভিমান দ্বারা শরীরে আবদ্ধ করে।

গুণাতীত ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার; গুণসাম্য সৃষ্টি করতে পারে না। একটা ঘর বানাতে হবে, অথচ কিছু নাই। ঘর বানানো যাবে না। ঘরটা বানাতে গেলে বিভিন্ন গুণ ও আকৃতির বস্তু-সকলের প্রয়োজন। যেমন, বিশেষ আকৃতি ও কাঠিন্য গুণযুক্ত ইট, ইটগুলোকে জোড়ার জন্য বিশেষ গুণযুক্ত সিমেন্ট, বিশেষ গুণযুক্ত বালি, তরল জল, বিশেষ গুণ ও আকৃতির কাঠ ইত্যাদি। প্রত্যেকটিরই প্রথম শর্ত পৃথক গুণবৈশিষ্ট্য। ঠিক তেমনি,

"গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠতান্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজত্তম।।" বি.পু.২য়. ৩৩

সৃষ্টিকালে গুণসাম্য (ব্রহ্ম) হতে গুণব্যঞ্জন (মহত্তত্ব) উৎপন্ন হলো।

"প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান।।" ঐ ৩৪

সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, এই তিনটি বৈকারিক গুণ সেই মহত্তত্ত্ব হতে সৃষ্ট।

এই সত্ত্ব, রজ, তম'ই গুণ। অহঙ্কার দ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন তামস অহঙ্কার হতেই ক্রমান্বয়ে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূতাদি ও তদ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্ট;আর জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই এই তিন গুণ বর্তমান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও বর্তমান।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ।
নিবধনন্তি মহাবাহ দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।" গীতা ১৪শ

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ-এই গুণত্রয় নিষ্ক্রিয় আত্মাকে দেহাভিমান দ্বারা শরীরে আবদ্ধ করে।

"তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধনাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।" গীতা। ১৪শ.

এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্ফটিকমণির ন্যায় নির্মল, স্বচ্ছ চৈতন্যপ্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ বলিয়া নিরুপদ্রব ও প্রকাশক। 'আমি সুখী' এইরূপ সুখাসক্তি এবং 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ জ্ঞানাসক্তি দ্বারা আত্মকে যেন আবদ্ধ করে। এই হচ্ছে সত্ত্ব গুণ।

"রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গমুদ্ভবম।
তন্নিবধনাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনাম্।।" গীতা ১৪শ

রজোগুণ রাগাত্মক। ইহা অপ্রাপ্তের অভিলাষ ও প্রাপ্তিবিষয়ে মনের প্রীতির

উৎপাদক। ইহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের নিমিত্ত কর্মে আসক্তি দ্বারা আত্মাকে যেন আবদ্ধ করে। আমিত্বের অভিমান দ্বারা কর্মে প্রবর্তিত করে। এই হচ্ছে রজোগুণ।

"তমোস্তজ্ঞানং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধনতি।।" গীতা ১৪শ

তমোগুণ আবরণশক্তি প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন এবং দেহধারিগণের মোহজনক। উহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা আত্মাকে দেহে যেন আবদ্ধ করে, নির্বিকার আত্মাকে যেন বিকারপ্রাপ্ত করে। এটাই তমোগুণ।

এই গুণগুলি সকল মানুষের মধ্যে থাকলেও তার প্রকাশ সবার মধ্যে সমান নয়। যেমন এক ব্রহ্ম ত্রিগুণ হয়ে প্রকটিত, তেমনি এই তিন গুণ বিভিন্ন শরীরে বিভিন্নভাবে প্রকটিত।

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।" গীতা ১৪শ অ.

সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় আর তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। এই গুণপ্রাবল্য বৈচিত্র্যই মানুষের বর্ণনির্ণয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ এই গুণের রূপ জেনেছি, এর প্রকাশ কেমন?

"সর্বদ্বারেষু দেহহস্মিন প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।। ঐ

যখন এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন জানিতে হইবে সত্ত্বগুণ বর্ধিত।

আর, "লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।" ঐ

লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা, হর্ষ ও অনুরাগাদির অনিবৃত্তি এবং বিষয়ভোগের স্পৃহা রজোগুণপ্রাবল্যের প্রকাশ।

আর, "অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জাযন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।" ঐ

কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, কর্তব্যে অবহেলা ও মূঢ়তা তমোগুণপ্রাবল্যের লক্ষণ।

"সত্ত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্বভূতাশ্রিতং বপু।।"

সত গুণের প্রকাশ জ্ঞান, রজঃ গুণের প্রকাশ রাগ ও দ্বেষ, তম গুণের প্রকাশ অজ্ঞান। এই হলো গুণবিভাগ। আর ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনই কর্ম।

অতএব সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ্য গুণ। রজপ্রধান ক্ষাত্রগুণ। রজ তম অবস্থান ও সাম্য, বৈশ্যগুণ। রজ তম অবস্থান ও তম প্রধান শূদ্রগুণ।

এই সূত্রেই যে ব্যক্তিতে যে গুণের প্রকাশ বেশি, সে বস্তু বা ব্যক্তি সেই গুণলক্ষণযুক্ত। অর্থাৎ **গুণগত বৈশিষ্ট্যে ব্রাহ্মণ সেই ব্যক্তি, যিনি নির্মল, পবিত্র,**

নির্লোভ, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত, নিরহঙ্কার, সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট ও সুখী, বিষয়বাসনা রহিত, সর্বজীবের হিতাকাঙ্খী এবং পরম জ্ঞানে নিরত ও তার দ্বারা উদ্ভাসিত তিনি। ক্ষত্রিয় তিনিই যিনি, বিষয়াকাঙ্খি, আসক্তিহীন, রাগ ও দ্বেষযুক্ত, বল-বীর্যদীপ্ত। বৈশ্য তিনিই যিনি প্রবল বিষয়াকাঙ্খি, কামনা-বাসনালিপ্ত। শূদ্র তিনিই যিনি অজ্ঞান, জড়বুদ্ধিযুক্ত, লোভ ও কামনা-বাসনা যুক্ত।

ব্রাহ্মণের কর্ম, "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনংতথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়াৎ ।।"

অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণ কর্ম।

"প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যায়নমেব চ।
বিষয়েষবপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়শ্চ সমাসতঃ।।"

প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও ত্যাগের মনোভাব ক্ষত্রিয় কর্ম।

"পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিকপথগ কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।।"

পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্যবসায়, সুদে অর্থ বিনিয়োগ ও কৃষি বৈশ্যকর্ম।

"একমেব তু শূদ্রস্য পভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রুষামনসূয়য়া।।"

শূদ্রের একটাই কর্ম, অসূয়াহীন সেবা। এখন আশাকরি এটা পরিষ্কার যে, চতুর্বর্ণ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সত্ত্বাগত গুণ ও কর্মের সামাজিক বিভাগ।

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বা কোনো প্রতিষ্ঠান, ক্ষেত্র যাই হোক, তা যদি সুগঠিত হয় তবে সেখানে দেখবো কিছু ব্যক্তি আছেন যারা বুদ্ধিবৃত্তীয় কাজ যেমন, পরিকল্পনা, সংযোগ ইত্যাদির দায়িত্বে। কিছু আছেন যারা শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকেন, কিছু থাকেন অর্থ ও ব্যবসায়িক লেনদেন এর কাজে, আর বাকিরা অপর তিন পর্যায়ের অধীনে শ্রম দান করেন। এরাই ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এটা কর্ম বিভাজন।

এখন এই যে চারটে কর্মবিভাগ, তার সকল বিভাগে কি সকলে নিয়োজিত হবে? না, কারণ আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব কোনো অশিক্ষিত, বুদ্ধিহীন, অনভিজ্ঞ, দক্ষতা ও বাক্যচাতুর্যহীন ব্যক্তিকে দেবো না। ঐরূপ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সাহসী, বলবান, কুশলী ব্যক্তিকে এবং ব্যবসায়িক বিভাগে সে বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করবো। বাকিদের শ্রমবিভাগে ও ভৃত্যরূপে নিয়োগ করবো। এই যে যোগ্যতার মাপকাঠি তাই গুণ।

আর এটাও দেখা যাবে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে দক্ষ সে সেই বিভাগেই যেতে চাইবে। এটা তার অন্তরসত্ত্বাগত গুণ। এই সত্ত্বাগত গুণকে অস্বীকার করলে বর্ণাশ্রম কুসংস্কার ও অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়। এর দ্বারা হিন্দু জাতির জাতীয় অবনমন ছাড়া উৎকর্ষ সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক, একটা পূর্ণবর্ণাশ্রমিক গ্রাম গঠন করা হবে। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার ভাগে বিভক্ত হয়ে ঐ গ্রামের মানুষ গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে নিয়োজিত হবে। দেখা গেলো জ্ঞানী, সদাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ,

ভক্তিপরায়ণ, সংযমী ব্যক্তিকে বলা হলো তুমি শূদ্র, তুমি গৃহস্থের জমি চাষ করবে, গরু-মোষ চড়াবে আর গৃহস্থের সেবা করবে আর মুর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, নাস্তিক, লোভীকে বলা হলো, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি গ্রামের মানুষকে ধর্মপোদেশ ও শিক্ষা দেবে, পূজার্চনা করবে ও করাবে, তাদের সৎপথে চালিত করবে। ভীতু, দুর্বল, অসহায়, দুঃখীকে বলা হলো তুমি আমাদের মোড়ল; তুমি গ্রামের শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, ঝুট-ঝামেলা মেটাবে, বাইরের আক্রমণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করবে; আর শিল্প ও কবিভাব যুক্ত, উদাসীন, আপনভোলাকে বলা হলো গ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক সমৃদ্ধির দায়িত্ব তোমার, তুমি বৈশ্য। এবার ভাবুন সে গ্রামের অবস্থা কী হবে।

শুধু জন্মসূত্র নয়, কোনো অজুহাতেই ব্যক্তির গুণ ও প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে অপর গুণ আরোপ করলে বা অপর কর্মে নিয়োগ করলে তার বিকৃত ফলই পাওয়া যাবে। হিন্দু জাতির অধঃপতন, হীনমন্যতা, অনৈক্য ও পশ্চাদপদের এটাই কারণ। যে দিন হিন্দু শাস্ত্রবিহিত গুণ, আচরণ ও কর্মকে অস্বীকার করেছে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে হিন্দুর পতন। পরিবার থেকে রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে এই একই নিয়ম। এটাই গুণ ও কর্ম ভিত্তিতে চতুর্বর্ণ বিভাগ।

চতুর্বর্ণ সনাতন হিন্দু জাতির সামাজিক কর্মবিভাগ এবং এই বিভাগে যাবার পদ্ধতিও একই। গুণ ও কর্মই বর্ণ; এই বর্ণাশ্রম সনাতন হিন্দু ধর্মের সুশৃঙ্খল সামাজিক গঠনের ও তার ক্রমোন্নোতির ভিত। সঠিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সঠিক কর্মাবলম্বন করেই নিজের ও সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে। তবুও যদি প্রশ্ন আসে, গুণ কি অনিবার্যভাবে বংশগত? বংশগত যদি হয় তবে আমার পূর্ব উল্লিখিত প্রমাণ ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হয় কি করে? দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধীর পুত্রদের তো পিতার মতো গুণবান হবার কথা। জেলের ছেলে আব্দুল কালামের তো অতবড় বিজ্ঞানী হবার কথা নয়। বিদ্বানের ছেলে বিদ্বান, মূর্খের ছেলে মূর্খ, ধার্মিকের ছেলে ধার্মিক হবার কথা। এরূপ দেখাও যায়, আবার বিপরীতও দেখা যায়। অর্থাৎ, 'বংশগত গুণ' নিশ্চিৎ নয়। বর্ণাশ্রমের পক্ষে যে প্রমাণগুলো তা বিশ্লেষণ করে এতদূর পর্যন্ত যা পেলাম তা হলো,-

(ক) ব্রহ্ম বা ভগবান কোনো স্থূল শরীর নয়, তাই তার মুখ, বাহু, ঊরু, পদ রুপক মাত্র এবং তা গুণরুপক।

(খ) বর্ণাশ্রম একটি সামাজিক বিন্যাস এবং তা গুণ ও কর্মের বিভাগ।

(গ) ব্যক্তি তার গুণ ও কর্মের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে কেউ জন্মায় না।

(ঘ) বর্ণাশ্রম বংশগত নয়।

এতক্ষণ বর্ণাশ্রম পক্ষীয় প্রমাণগুলো যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেলো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থগুলোতে কিছু আছে কি না দেখা যাক।

শ্রীশ্রী গীতার আকর গ্রন্থ মহাভারত, যাকে ব্যাসদেব বেদ-বেদাঙ্গের সার এবং একই সঙ্গে ইতিহাস ও পুরাণ বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে মহর্ষি ভৃগু বলছেন,

"নঃ বিশেষহন্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদংজগৎ।

ব্রাহ্মণাঃ পূর্বসৃষ্টং হি কর্মাভিবর্ণতাং গতম্।" মহাঃ শান্তি, ১৮৮

বর্ণবিশেষ বলে কিছু নাই, ব্রহ্মের সন্তান এই জগৎ, মানুষ মাত্রেই ব্রহ্ম হতে সৃষ্ট, সেই ব্রহ্মের সন্তানরূপে সব মানুষ ব্রাহ্মণ। মানব সভ্যতার পার্থিব প্রগতির সাথে সাথে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আসে অনেক পরিবর্তন। সমাজ বিস্তৃত হয়, সৃষ্টি হয় বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির। মানুষ তার নিজ সত্ত্বার অনুরূপ কর্ম ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিগত কর্মে লিপ্ত হয় জীবিকার কারণে। এভাবেই ব্রাহ্মণ থেকে গুণ-কর্ম ভিত্তিতে এসেছে যুদ্ধবিগ্রহকারী ও প্রজাপালক শ্রেণী, এই গুণগত কর্মের জন্য তারা হয়েছে 'ক্ষত্রিয়'। চাহিদা অনুযায়ী এসেছে বিনিময় ব্যবস্থা, যা বর্ধিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপ পেয়েছে। এই গুণকর্মে যারা যুক্ত হয়েছে তারা হয়েছে 'বৈশ্য'। যারা উৎপাদন, শ্রম এবং সেবারূপ গুণকর্ম গ্রহণ করেছে, তারা 'শূদ্র'।

এবিষয়ে মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি ভরদ্বাজের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি ভৃগু বলেছেন, "যাঁহারা জাতকর্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদধ্যয়ানে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সান্ধ্যবন্দনা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই ষটকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; যাহারা শৌচাচার পরায়ণ, নিত্যব্রতনিষ্ঠ (নিত্য নিয়মনিষ্ঠ), গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ (প্রিয় আচরণ), অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদধ্যয়ন, যুদ্ধকার্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হন। আর যাঁহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি ব্রহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় (শূদ্রকর্ম) ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোনো ব্যক্তি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়া ব্রহ্মণের ন্যায় (ব্রাহ্মণ্য গুণ ও কর্ম) নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাহাকে ব্রহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।" মহাঃ শান্তি ১৮৯।

ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবালা পুত্র সত্যকাম ঋষি হারিদ্রুম গৌতমের নিকট নিবেদন করলো, "আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্যবাস করিব; এই জন্য আসিয়াছি।"

ঋষি জানতে চাইলেন তার গোত্র। উত্তরে সত্যকাম অকপটে ব্যক্ত করল মায়ের কাছে শোনা তার নিন্দিত জন্মবৃত্তান্ত, "আমি যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পাপচারিণী হইয়া বহু (পুরুষের) পরিচর্যা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। এই অবস্থায় আমি জানি না তুমি কোন্ গোত্রীয়।..." অর্থাৎ, অজ্ঞাত ব্যক্তির ঔরসে এক সাধারণীর গর্ভজাত সন্তান 'সত্যকাম'। ঋষি গৌতম কী বললেন;

"...নৈতদব্রহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ
ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয়..."

অর্থাৎ তুমি সত্য হতে বিচলিত নও, ব্রাহ্মণই এইরূপ সত্য বলিতে পারে, আমি

তোমাকে উপনীত করবো...। এখানে দেখতে পাচ্ছি ঋষি ব্যক্তির গুণকেই বর্ণ-পরিচায়ক রূপে গ্রহণ করছেন। গুণই বর্ণনির্ণায়ক।

তপ এবং বীজ প্রভাবে যুগে যুগে মানুষ উৎকর্ষ-অপকর্ষ প্রাপ্ত হচ্ছে।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।।" মনু ১০, ৪৩

ব্রাহ্মণ ক্রিয়া ও দর্শনাভাবে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং পরে বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। বর্ণ কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে বাবার সম্পত্তি ছেলের হবে। এ এক জীবন চর্চা। পণ্ডিতের পুত্রকে পণ্ডিত হতে গেলে ঐ গুণের অধিকারী হতে হয়, তা জন্মসূত্রে পাওয়া যায় না। চিকিৎসকের পুত্রকে চিকিৎসক হতে চিকিৎসা বিদ্যা শিখতে হয় ও তাতে নিয়োজিত থাকতে হয়। অধ্যাপকের পুত্র রিক্সাচালক হলে সে যেমন অধ্যাপক রূপে পরিচিত না হয়ে রিক্সাচালক রূপে পরিচিত হয় তেমনি ব্যক্তির জীবনচর্চাই ঐ ব্যক্তি কোন বর্ণের তা নির্দিষ্ট করে।

"জন্ম না জায়তে শুদ্র
সংস্কারাৎ দ্বীজচ্চতে।
বেদপঠাৎ ভবেৎ বিপ্র
ব্রহ্মজানতি স ব্রাহ্মণঃ।।" যা. স্মৃ.

ব্রহ্মের সন্তানরূপে সবাই ব্রাহ্মণ, কিন্তু তা গুণ ও কর্মভিত্তিক বর্ণাশ্রমে নয়। অসংখ্য শিশু জন্মায়, কেউ বিদ্যালয়ে যায়, কেউ যায় না। যারা বিদ্যালয়ে যায় তারাও সমান হয় না। কেউ শিক্ষার উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে,কেউ মধ্যবর্তী স্তর পর্যন্ত যেতে পারে, আবার কেউ সাক্ষর হয়েই থেমে যায়। যারা বিদ্যালয়ে যায় না তারা অশিক্ষিত থেকে যায়। এদের কর্মজীবনও হয় সেইরূপ। তেমনি মানুষ অশিক্ষিত বা শূদ্র হয়ে জন্মায়, সংস্কার দ্বারা জ্ঞানলোকে যখন তার দ্বিতীয় জন্ম হয় তখন সে হয় দ্বিজ, বেদজ্ঞান অর্জন করে হয় বিপ্র, ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করে হয় ব্রাহ্মণ।

আমরা সৎ ব্যক্তির আসৎ পুত্র, দ্বিজসূত্রধারী অসংস্কৃত ব্যক্তি দেখতে পাই। চোর বদমাসদেরও সাধু সেজে থাকতে, ছল জপ-তপ, পূজা-অর্চনারত দেখতে পাই। **সাজ ও জপ, তপ, পূজা যদি সাধুর চিহ্ন হয় তবে সাধুবেশি চোর, গুণ্ডা, খুনি, ধর্ষকও সাধু। যদি জন্মই বর্ণের কারণ হয় তবে, মিথ্যাবাদি, লম্পট, চোর, খুনি ব্রাহ্মণসন্তান হবার কারণে ব্রাহ্মণ হয়, সেই কারণে সেই লম্পট যদি বর্ণশ্রেষ্ঠ হয়, সেই কারণে সেই মিথ্যাবাদী, খুনি যদি সকলের প্রণম্য হয়, তবে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ হবে কেন? ব্রাত্য, নীচ, ঘৃণ্য ইত্যাদি শব্দগুলো অপ্রাসঙ্গিক বা ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে সমার্থক হয়ে যায় না কি?**

যদি দ্বিজসূত্রধারী নিরক্ষর হয়, জ্ঞানজগৎ থেকে অবস্থান যদি বহু দূরে হয়, দ্বিজ জীবনাচার পালন যদি সে না করে তবে তার দ্বিজ সূত্র প্রতারণার প্রতীক নয় কি? সাধুবেশ যদি সাধুতার লক্ষণ হয় তবে সাধুবেশি খুনি, তস্করও তো সাধু? জগতে মানুষের অন্তরপ্রকৃতি এক রূপ নয়। বিচিত্র মন, মানসিকতা, প্রবৃত্তি, রুচি ও প্রকৃতি তাদের। আর এসব কোনো ধারাবাহিক গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয় না। এক

পিতার চার পুত্রের চার প্রকার মানসিক গঠন, রুচি, প্রবৃত্তি, আচরণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। আবার একই ব্যক্তি আজীবন একই স্বভাব ও আচরণের নাও থাকতে পারে। প্রথম জীবনে যে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছিল বা ধন-সম্পদ, বিষয়-আশয় ও ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল হঠাৎই তার মধ্যে দেখা গেল সাত্ত্বিক সংযত জীবনাচার। বা সাত্ত্বিক সাধু সন্ত ব্যক্তিও লোভ, লালসা, লাম্পট্যে ডুবে যায়। এমন প্রায়শই দেখা যায়। যিনি জ্ঞানী, সৎ, নির্লোভ, পরহিতৈষী, শ্রদ্ধাপরায়ণ, ঈশ্বর চিন্তামগ্ন, সে ব্রাহ্মণ; আবার যে তস্কর, খুনি, লম্পট, লোভী, প্রতারক, জ্ঞানহীন, নাস্তিক, স্বার্থপর, আচার ও নিষ্ঠাহীন সেও ব্রাহ্মণ; যে সাহসী, বীর, মুমুক্ষু, অপরের রক্ষক সে ক্ষত্রিয়, আবার যে ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপর, সেও ক্ষত্রিয়; যে বণিক, ধনী, ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন সে বৈশ্য, আবার নির্ধন, অপরের দাস সেও বেশ্য; জড় বুদ্ধিসম্পন্ন অপরের ভৃত্য শূদ্র আবার একজন অধ্যাপকও শূদ্র; এটা যদি হয় তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি বর্ণগুলির স্বার্থকতা থাকে না। গুণ, কর্ম, আচরণ যদি বর্ণের কারণ বা পরিচায়ক না হয় তবে কোনো বর্ণাশ্রমের অস্তিত্বই টেকে না।

"ন যোনির্ণাপিসংস্কারো নাশ্রুতম ন চসন্ততিঃ
কারণানি দ্বিজত্বস বৃত্তমেব তু কারণম্ ।।" ভা. পু.

"জন্মসূত্র ধরে বর্ণ নির্ণীত হয় না, আনুষ্ঠানিক সংস্কার দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হয় না, শুধুমাত্র বৃত্তি দ্বারাও বর্ণ নির্ণীত হয় না। আচরণই বর্ণের পরিচায়ক।"

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি, বৈশ্যাঃক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।" ভা. পু.

"সর্বোরং ব্রাহ্মণ লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে
বৃত্তিস্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি।।" মহা. ভা.

"শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদগুণান উপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রাহ্মং ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ।
আর্জবে বর্তমানস্য ব্রহ্মণ্যমতিজায়তে।।" মহা. ভা.

"শুদ্র ব্রাহ্মণেতামেতি ব্রাহ্মণসচৈতি শূদ্রতাম।" মনু. স্মৃ.

আচরণই ব্যক্তির পরিচায়ক। ইতিহাস থেকে বর্তমানের এই পৃথিবী, যেখানে তাকানো যাবে দেখা যাবে আচরণেরই পরিচয়। ব্যাস, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র; শঙ্করাচার্য, রামানুজম, রামদাস, মহীদাস, নানক, কবীর, দাদু, রুইদাস, চৈতন্যদেব; মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সবাই তাঁদের আচরণেই পরিচিত। তাঁদের থেকে তাঁদের আচরণটুকু বাদ দিলে তাঁদের আর কোনো পরিচয় থাকবে না। এই আচরণ আসে মানুষের সত্ত্বার প্রকৃতি থেকে, নিয়ত অভ্যাস থেকে। তাই গুণ ও কর্মই ব্যক্তির বর্ণের পরিচায়ক। মানুষ যে পিতা-মাতার সন্তানই হোক না কেন সে তাঁর স্বপ্রকৃতিগত গুণ ও আচরিত কর্ম দ্বারা যে-কোনো বর্ণে উত্তরণ বা অবতরণ করতে পারে। দেবাপি, সত্যকাম, বিশ্বামিত্র, ঐতরেয়, মুদ্গল এভাবেই ব্রহ্মণত্বে উন্নীত হয়েছেন; পুরুরবা, চ্যাবন, হরিশ্চন্দ্র, তিতিক্ষু, উশিনর এভাবেই ক্ষত্রিয় হয়েছেন; তুর্বসু, অনু, পৃষদ্ধ এভাবেই শূদ্র ও ম্লেচ্ছ হয়েছেন। এভাবেই ব্রহ্ম সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রে পরিণত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি দ্বারা অপরকে এক বর্ণ থেকে অপর বর্ণে উত্তরণ বা অবতরণ করানোর দৃষ্টান্তও শাস্ত্রসমূহে যথেষ্ট দেখা যায়। অপরাধ, অন্যায় আচরণ, অপকর্মের কারণে অভিশপ্ত হয়ে চণ্ডালত্ব, রাক্ষসত্ব, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হতে শাস্ত্রসমূহে প্রায়শই দেখা যায়। ভগবান মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর গুরুর গো-হত্যার অপরাধে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মনে রাখতে হবে এখনকার মতো তখন গো-হত্যা গর্হীত অপরাধ ছিল না। পৃষধ্রের অপরাধ, সে গুরুর গুরুর অন্যায় ক্ষতিসাধন করেছিল। রাজা বিতহব্য অপর রাজকুমার কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে আশ্রয় নিলে মহর্ষি ভৃগু বিতহব্যের প্রাণ রক্ষার্থে তাকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে এবং বিতহব্য ব্রাহ্মণ ঘোষিত হওয়ায় ক্ষত্রিয় রাজা বিতহব্য মৃত ধরে নিয়ে প্রতর্দন তাকে ত্যাগ করেন। সে দিন হতে ক্ষত্রিয় বিতহব্য ব্রাহ্মণ রূপেই স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষে পশ্চিমপ্রান্ত হতে যখন মুসলিম আক্রমণ শুরু হয় তখন অস্পৃশ্য শক, হুণ, গুর্জর, জাঠ, আভিরদের যজ্ঞশুদ্ধি করে ক্ষত্রিয় করা হয়। মহারাজা শিবাজীকে ব্রত ও যজ্ঞশুদ্ধি দ্বারা ক্ষত্রিয় করে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়। সেন রাজবংশের রাজত্বকালে বল্লাল সেন রাজ-আদেশের দ্বারা বর্ণাশ্রমের অনেক পরিবর্তন করেন, কৌলিন্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, নবসাঁখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, সামবেদীয় ব্রাহ্মণের এক বড় গোষ্ঠিকে রাজাজ্ঞা অবমাননার কারণে ব্রাহ্মণত্ব কেড়ে নিয়ে শুদ্রে অবনমন ঘটান। বাংলায় কলকাতা নগরীর উত্থানকালে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মধ্যবিত্ত হিন্দু রাজা নবকৃষ্ণদেবের তত্ত্বাবধানে উচ্চবর্ণে উন্নীত হয়ে নতুন পরিচয় পেয়েছে। ব্রাহ্মণ্য যুগের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ব্রতের কঠোরতা থেকে মুক্তি পেতে উপবীত ত্যাগ করে বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র হয়ে গেছে। আবার বিভিন্ন সময়ের ধর্মীয়-সামাজিক পুনর্গঠনকালে উপনয়ন ধারণ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণে আশ্রয় পেয়েছে। এমনকি বিধর্মী সুলতান মামুদের আদেশে গ্রীকরা হিন্দুসমাজে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে স্বীকৃতি পায়। বর্ণ কোনো স্থায়ী সম্পত্তি নয় যে, বাবার পরে ছেলের, ছেলের পরে নাতির-এইভাবে চলতে থাকবে, আর ন্যায়, নীতি, দায়িত্ব, কর্তব্য, জ্ঞান, শিক্ষা, আচরণহীন নামসর্বস্য বর্ণশ্রেষ্ঠরা মনুষ্যত্বের, ধর্মের, শাস্ত্রের অপমান করবে আর সমাজকে ভঙ্গুর থেকে ভঙ্গুরতর করে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে; তা চলতে পারে না।

(১) যিনি জ্ঞানী, সদাচারী, ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ, নির্লোভি, অক্রোধ, সর্বভূতে মমত্বসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রীয়, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যাশ্রয়ী, সদাচারী, তিনি ব্রাহ্মণ।

(২) যিনি মুমুক্ষু, সাহসী, বীর, যোদ্ধা, প্রজাশাসন ও প্রতিপালন করেন এবং দেশ ও প্রজারক্ষা করেন তিনি ক্ষত্রিয়।

(৩) যিনি বিষয়াসক্ত, বাণিজ্য ও উৎপাদনকর্মে লিপ্ত, তিনি বৈশ্য।

(৪) যিনি অজ্ঞান, বুদ্ধিমত্ত্বাহীন, অপর দ্বারা পরিচালিত, তিনি শূদ্র।

এখনও যাদের গোঁড়ামি আছে তাদের জন্য আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

"যোহধীতেহহন্যেতাং ত্রীনি বর্ষান্যতান্দ্রিতঃ।

স এগাপরমজ্যেতিবায়ুভূতঃ ব্রহ্মানো মুখম্।"

অর্থাৎ যে অনলসভাবে তিন বৎসর প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে সে বায়ুর ন্যায় যত্র তত্র গমন করতে পারে এবং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

"ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।

স শূদ্রবদ্ধহিষ্কার্যঃ সর্বস্মাদ্দবিজকর্মন।"

অর্থাৎ - যে প্রাতসন্ধ্যায় দণ্ডায়মান এবং সায়ংসন্ধ্যায় উপবিষ্ট হয় না সে শূদ্র, তাকে সমস্তপ্রকার দ্বিজকর্ম থেকে বহিষ্কার করা উচিৎ।

"যথা কষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্মময়োমৃগ।

যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্ত্রয়স্তেনাম বিভ্রাতি।।"

অর্থাৎ-কাঠের হাতি আর চামড়ার হরিণের মতো শাস্ত্রজ্ঞানহীন বিপ্র নামের বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

"যোহনধিত্য দ্বিজ বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শুদ্রত্বমাস্তুগচ্ছতি সন্বয়ঃ।।"

অর্থাৎ- বেদপাঠ না করে যে দ্বিজ অপর বিষয়ে শ্রম করে, সে জীবদ্দশায় শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

"শিল্পেন ব্যবহারেন শূদ্রপতৈশ্চ কেবলঃ।

গোভিরশ্বেশ্চ যানেশ্চকৃশ্চা রাজোপসেবয়া।।

অযায্য যাজনৈশ্চেব নাস্তিক্যেন চ কর্মনাম্।

কুলান্যাশু যানি হীনানি মন্ত্রতঃ।।"

শিল্প, সুদে টাকা দেওয়া, শূদ্রজাত সন্তান, গো অশ্ব ও যানের ক্রয়-বিক্রয়, রাজসেবা, ব্রাত্যযাজন, শ্রৌতকর্মের প্রতি নাস্তিক্যবুদ্ধি ও বেদের অনধ্যয়ন হেতু কুল ও বর্ণ নষ্ট হয়।

আর একটি কথা, সনাতন হিন্দু জাতি শুধুমাত্র বর্ণাশ্রমীকই নয়; চতুর্বর্গ, চতুরাশ্রম, চতুর্বর্ণ ও দশ-সংস্কারবিধি সনাতন হিন্দুর জীবনাচারের চারটে স্তম্ভ। চতুর্বর্গের ধর্ম ও মোক্ষ আর কাম্য নয়। চতুরাশ্রমের গার্হস্থ্যই বর্তমান; ব্রহ্মচর্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস হিন্দু ত্যাগ করেছে। দশসংস্কার বিধির সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাসন, উপনয়ন ও আন্তেষ্টি বর্তমান তাও বাহ্যিক, বাকি ছটা সংস্কার পরিত্যাক্ত। অথচ বর্ণাশ্রম নিয়ে মানুষ (বিকৃত রূপেই) খুব সচেতন। কেন? এর দ্বারা অহমিকার প্রতিফলন ঘটানো যায় তাই? হিন্দুর মধ্যে দেখি এক তীব্র জড়তা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রতি, তা সু-সংস্কারই হোক আর কু-সংস্কার। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা বা যে-কোনো ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে দেখি মতানৈক্য ও তীব্র বিবাদ। এটা এরকম নয়, ওটা ওরকম নয়; আমাদের এভাবে হয়, তোমাদের ওভাবে হয়। আমাদের এটা নাই, তোমাদের ওটা আছে। এমনকি বিয়েতে স্বামী স্ত্রীকে বামহাতে না ডানহাতে সিঁদুর পরাবে, হাত দিয়ে না সোনার আঙটি দিয়ে না কয়েন দিয়ে না ধান মাপা কাঠা দিয়ে তাই নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক; অন্নপ্রাশনে আগে খাওয়া না আগে আশীর্বাদ তাই নিয়ে বিতর্ক।

এই বিতর্কের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে আমি অনেক সময়ই ব্যথিত হয়ে পাশ থেকে

জিজ্ঞাসা করেছি 'আপনারা সবাই হিন্দু তো?' উত্তর এসেছে 'হ্যাঁ'। আবার জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনারা যে ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে বিতর্ক করছেন তা এইসব মতবাদের উৎস কী? উত্তরে সবাই স্তব্ধ। অর্থাৎ তারা জানে না। আবার প্রশ্ন করেছি, হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের উৎস কী? এবারও স্তব্ধ। কিচ্ছু জানেনা অথচ তাই নিয়েই মহা বিতর্ক। আবার এদের সনাতন ধর্ম ও দর্শনকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনীহা ও উদাসীনতা। অধিকাংশ হিন্দুই জানেনা তাদের দর্শন কী? অধিকাংশের বাড়িতেই কোনো ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থ নাই। যারা কিছু জানে বা যার বাড়িতে কোনো গ্রন্থ আছে তা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, একটা গীতা বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবৎপুরাণে সীমাবদ্ধ। তবে তা জানার জন্য নয়, পূজাপাঠের জন্য ঠাকুরঘরের কুলুঙ্গিতে অধিষ্ঠিত। যারা একটু আধটু পড়েন তারা মনে করেন পাঠেই পুণ্যলাভ, জানা ও বোঝার ধারে কাছেও যাননা। এক বৎসর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

আমাদের পাশেরই একটা গ্রামে হনুমান মারা যাওয়ায় গ্রামের মানুষ তার আন্তেষ্টি ও শ্রাদ্ধকর্ম করতে চায়। তারা পুরোহিতের কাছে কবে শ্রাদ্ধকর্ম হবে জানতে চাইলে পুরোহিতমশাই অনেক মাথাচুলকে বিধান দেন 'তের দিনে করো'; গ্রামে আরো কয়েকজন পুরোহিত আছেন তাঁদেরও আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞেস করায় কেউ তিন দিন, কেউ আঠারো দিন আবার কেউ এক মাসের বিধান দেন। তবে সবাই মাথা চুলকে চুলকে। অর্থাৎ কেউ কিছু বোঝেন না।/ তবে লক্ষণীয় এটাই যে শ্রাদ্ধে কি কি লাগবে সে বিষয়ে তাদের টনটনে জ্ঞান। তাই হনুমানের শ্রাদ্ধে বিধান দিলেন শ্রাদ্ধে যা যা লাগে সেই বিশাল সম্ভার তো লাগবেই তার সঙ্গে হনুমানের ধুতি, ভ্রমণের ছড়ি, বিছানা, খরম, শ্রীরামচন্দ্রের ও লক্ষণের ধুতি, মা সীতার শাড়ি, ভগবান শিবের ধুতি, মা দুর্গার শাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি, কারণ তা তাদের জুটবে। কেউ কেউ অবশ্য কিছু ছাড় দিয়েছেন। এঁরা কেউ কিছু জানে না, জানতেও চায় না। এঁদের না আছে জ্ঞান, না আছে জ্ঞানার্জনের বাসনা। ত্যাগ, সংযম, বিদ্যা, ভক্তি, সেবা থেকে এঁরা বহু দূরে। উদরপুর্ত্তির প্রয়োজনে বাজার থেকে আচার-অনুষ্ঠানের একটা চটি নোটবই কিনে নিয়ে পৌরহিত্য এঁদের পেশা। পূজা-অর্চনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এঁদের লোভ-লালসার দৃশ্যের সঙ্গে হিন্দু মাত্রেই পরিচিত। এঁরাই ব্রাহ্মণ নাম নিয়ে হিন্দুসমাজের মস্তিষ্ক যেদিন হয়েছেন সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে হিন্দুর পতন।/ সত্যকে জানা ও বোঝার দ্বারাই অন্ধত্ব দূর করে হিন্দুর উত্তরণ সম্ভব, অন্যভাবে নয়। তবুও যাঁরা বলবেন প্রচলিত প্রথা, তাদের জিজ্ঞেস করি, ধর্মের নামে, দর্শনের নামে প্রচলিত প্রথা ধর্ম ও দর্শনকে উপেক্ষা ও বিকৃত করে যদি হয় তবে তা অধর্ম নয় কী? বিকৃত হলেও প্রচলিত প্রথা যদি অনুকরণীয় হয় তবে আপনার বিধবা মা, মাসি, পিসি, বোনকে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিতায় তোলেননি কেন? মেয়েদের স্কুল-কলেজে, চাকরিক্ষেত্রে পাঠান কেন? ঘরে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের অবিবাহিত কন্যা আছে কেন? স্বগোত্র বিবাহ দেন কেন? সমুদ্র পার হন কেন? নিষিদ্ধ খাদ্য খান কেন? যবন স্পর্শিত আহার করেন কেন? ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থই কী সবকিছুর মূলে? এবার ভাবুন।

বৈদিক সমাজে বর্ণভেদ ছিলো না।

''নানানং বা উ নো ধিয়ো বিত ব্রানি জনানাম।

তক্ষা রিষ্টং রুতগ ভিসগব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছন্তীদ্রয়েন্দো পরি স্রব।।''

ঋক, ৯, ১১২/১

অর্থাৎ হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য এক প্রকার নয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদের কার্যও নানা প্রকার। দেখ তক্ষ কাঠতক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে চায়। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

''কারুরহং ততো ভিষগুপলপরক্ষিণী নানা।

নানাধিয়ো বসূযবোহনু গা ইব তস্তিমেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব।।'' ঋক, ৯, ১১২/৩

অর্থাৎ দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা যব ভর্জনকারি। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করছি...।।

যজ্ঞের স্তোত্রপাঠ বিপ্রকর্ম, চিকিৎসা নীচকর্ম বলে বৈদিক শাস্ত্রে উক্ত, যবভর্জন শূদ্র কর্ম, এগুলো একই পরিবারে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। বায়ুপুরাণ বলছে বৈদিক ঋষি গৃদসমদের পৌত্র শৌনকের পুত্ররাই তাঁদের কর্মের পার্থক্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ প্রাপ্ত হয়েছিল। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে— তপস্যাসিদ্ধ ঋষিরা নিজ গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেন। আরও বলা হয়েছে ত্রেতা যুগে ঋষিরা চারটে বর্ণের বিধান দেন।

আর একটি কথা বলার আছে, অনুবাদ গ্রন্থগুলোর অধিকাংশতেই দেখা যায়, দ্বিজ ও বিপ্র শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ করেন। বাস্তব সমাজে উপবীতধারী মাত্রেই ব্রাহ্মণ ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজ, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ এক নয়। এবং উপবীত ধারণকারী মাত্রেই ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের দ্বিজত্ত্ব আছে। দ্বিজ অর্থ দ্বিতীয় জন্ম। মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়া শারীরিক জন্ম, আর উপনয়ন দ্বারা জ্ঞান জগতে পদার্পণ নিজেকে, জগৎকে, ঈশ্বরকে জানার জগতে দ্বিতীয় জন্ম। জগতের উন্নততর কর্মের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, উপনয়ন জ্ঞানের জগতে পদার্পণ। সেখান থেকে রুচি ও অভিপ্রায় মতো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণীয় কর্মে যাবার জন্য শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে হয়। যে জ্ঞানের জগতে পদার্পণ করে না, জ্ঞানার্জন করে না, তার দ্বারা উন্নততর কর্ম সম্ভব নয়, তাই তার কর্ম শ্রম ও সেবা; সে শূদ্র। উপনয়ন সূত্র বা দ্বিজচিহ্ন ব্যক্তির ন'টি বিশেষ গুণের প্রতীক।

''আচারোবিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা চ তির্থদর্শনম্।

নিষ্ঠাবৃত্তিতপোদানোঃ নগুন দ্বিজলক্ষণম্।।''

এই গুণগুলি ধারণ না করে দ্বিজ চিহ্ন ধারণকারীকে শাস্ত্র 'বকব্রতী' ও 'বিড়ালব্রতী' বলেছে।

আজ যারা ভীতির কারণ, তারা আমাদেরই ছিল।

ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ ও রক্ষায় চতুর ও বুদ্ধিমান শ্রেণী চিরকাল সব

রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মেই আইন ও ধর্মকে ব্যবহার করে আসছে, হিন্দুধর্মও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মের যেটা হয়েছে সেটা হল, তা এই হিন্দু সমাজ ও তার দেশকে বিপন্ন করেছে, যা আর কোনো জাতির ক্ষেত্রে ঘটেনি। এই স্বার্থ চরিতার্থের স্বার্থে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলোকেও বিকৃত করেছে। পুরাণগুলোর মধ্যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় প্রক্ষিপ্ত করে সেগুলোকে শোষণ ও আত্মম্ভরিতার হাতিয়ার বানানো হয়েছে। আঠারোটা পুরাণের স্থানে আরও আঠারো-বিশখানা উপপুরাণ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষ্ণুভাগবৎ, দেবিভাগবৎ আদি এইসব পুরাণগুলোয় সামাজিক বর্ণবৈষম্যকে আরও প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই উপ-পুরাণগুলি মুসলমান বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের উদ্দেশ্য সাধনে হিন্দুদের আরও বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য তাঁবেদার হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের দ্বারা রচিত বলে বহু ঐতিহাসিকরা মতপ্রকাশ করেছেন। ঐ সময়ে পৌরাণিক বিধান, অশৌচবিধি ও বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ বিধানের ত্রুটি ও লঙ্ঘনের কারণে হাজার হাজার হিন্দু জাতিচ্যুত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তৎকালীন হিন্দু সমাজে তথাকথিত ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের প্রতি কি মাত্রায় পৌঁছেছিল তা রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন,
সান্ডাইল জাজপুর হইয়া যবন।
দেউল-দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়,
হাতে পুঁথি কইরা কত দোয়াসি পালায়।"

অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাধারণ হিন্দু যবন মুসলমানদের ঐ তথাকথিত অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের দমনকারী ও নিজেদের পবিত্রতা রূপে, দেবতা নিরঞ্জন রূপেই দেখেছিল। ফলে আগত মুসলমানদের বিশাল হিন্দু সমাজের বাধার মুখে তো পরতে হয়ইনি বরং সাধারণ হিন্দু তাদের আবাহন করেছে, পরিত্রাতার ধর্ম গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধরা যখন হিন্দু ধর্মের কাছাকাছি এসে পরেছে, প্রায় হিন্দু জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছে তখনও বর্ণহিন্দু তাদের স্বসম্মানে গ্রহণ করেনি; শূদ্র, অর্বাচিন, উপহাসের পাত্র করে রেখেছে। বিশাল সংখ্যক এইরূপ বৌদ্ধহিন্দু পরিত্রাণের আশায় ও মুসলমান আক্রমণ থেকে বাঁচতে মুসলমান হয়েছে। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় উপকূলবর্তী এলাকায় মৎসজীবী সম্প্রদায় বিপদে পড়ে। যারা ধর্মচ্যুত হবার ভয়ে সমুদ্রযাত্রা ত্যাগ করে তারা রুজি-রোজগার হারিয়ে চরম দুর্দশায় পতিত হয়, আর যারা পেটের টানে সমুদ্রযাত্রা ত্যাগ করতে পারে না, তারা জাতিচ্যুত হয়। মুসলমান পীর, দরবেশ, ধর্মনেতা দ্বারা এরা ইসলামের সাম্যবাদ আর সমাজ, ধর্ম ও কর্ম জীবনের লাঞ্ছনা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজে পায়। দলে দলে উপকূলবর্তী কর্মহীন, জাতিচ্যুত ধীবর সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ তথাকথিত ব্রাহ্মণ সমাজের কোপ আর ইসলামের তলোয়ারের মাঝে বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দুর ধর্মনেতারা, বিধানকর্তারা, সমাজপতিরা হিন্দুকে

রক্ষার প্রয়োজন বোধ করেনি। মালাবার উপকূল এলাকার 'মোপলা বিদ্রোহ' ইতিহাসে সুবিদিত। 'বিদ্রোহ' নাম দিলেও যা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ। কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইসলাম দুনিয়ার খলিফা তুরস্কের রাজার পতন। যার সঙ্গে হিন্দুর কোনো সম্পর্কই নাই তাকে কেন্দ্র করে হিন্দুর উপর আক্রমণ; যাতে কয়েক হাজার হিন্দু প্রাণ হারায়, অজস্র হিন্দু নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হয়, প্রায় চল্লিশ হাজার হিন্দু প্রাণের দায়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এই মোপলা কারা? মুসলমান আক্রমণের পূর্বে যে সব আরব বণিক মালাবার উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করে তারাই মোপলা নামে পরিচিত। কিন্তু এরা সবাই আরবীয় নয়, এদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত ভারতীয় হিন্দু। ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে আরব বণিকরা বাণিজ্য করতে এলে মালাবারের হিন্দু 'জামোরিন' রাজারা ব্রাহ্মণদের পরামর্শে তাদের সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য আহ্বান করে এবং রাজ্যে তাদের বসতি স্থাপনের জন্য সমস্তরকম সুবিধা প্রদান করে। তাদের ধর্মপ্রচারের অনুমতি ও সাহায্য দেয়, এমনকি ধীবর সম্প্রদায়ের প্রতি পরিবার থেকে একজনকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আদেশ জারি করে। উৎসাহদান ও জবরদস্তির কারণে দলে দলে হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু থাকাকালীন যারা ব্রাহ্মণদের পণের-বিশ হাত কাছেও আসার অধিকারী ছিলনা তারা মুসলমান হয়ে ব্রাহ্মণদের পাশে বসার অধিকার পেলো। ব্রাহ্মণরা টিকি দুলিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করলো 'অর্বাচীন, অস্পৃশ্য শূদ্রগুলোকে কেমন জব্দ করেছি' এই ভেবে।

অভিভক্ত ভারতের সবচাইতে মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা ও পাঞ্জাব। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জনগণনায় বাংলার ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭ হাজার ৮০৭ জন জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৩ শত ৪৯ জন মুসলমান দাঁড়ায়। এদের মধ্যে স্থান বিশেষে ৪ থেকে ৭ শতাংশই বহিরাগত, আর বাকি ধর্মান্তরিত হিন্দু। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের পাঞ্জাব প্রদেশের জনগণনায় সেখানকার মুসলিমদের ৮৩.৩৩ শতাংশ ধর্মান্তরিত হিন্দু পাওয়া যায়। এরা হিন্দুর জন্যই হিন্দুসমাজ থেকে চলে গিয়ে হিন্দুরই ভয়ের কারণ হয়েছে, দেশ বিভাগের কারণ হয়েছে। শুধু নিম্নবর্ণীয়রা বা গ্রীক, শক, হূনরাই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়নি; পিরালী ব্রাহ্মণ, ভোজর ব্রাহ্মণ, হুসেইনী ব্রাহ্মণরাও ব্রাত্য হয়ে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছে। তবে বহু উচ্চবংশীয় ও ব্রাহ্মণও লোভের বশবর্তী হয়ে মুসলমান হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

''হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।'

'চৈতন্যমঙ্গল'-বৃন্দাবন দাস

রাজা গণেশের পুত্র যদু রাজ্যলোভে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে। হিন্দুকে রক্ষা করার বিষয়ে হিন্দু ধর্মনেতারাও উদাসীন ছিল সেটা এখানে স্পষ্ট। যারা নিজেদের হিন্দুর

ধর্মনেতা, সর্বময় কর্তা ও বিধাতারূপে দেখতো, হিন্দুরা যাদের বিধানকর্তা, ত্রাণকর্তা রূপে জানত; যাদের বিধান ও নির্দেশ হিন্দুর কাছে অলঙ্ঘনীয় ছিল তারা শুধু 'কিল মারার গোঁসাই'ই ছিল। তারা হিন্দুর সমাজ রূপ ঘরের বাইরে যাবার পথটাই খোলা রেখেছিল আর হিন্দুকে ঘরের বাইরে বের করে দিতেই জানতো। সমাজকে ধারণ ও রক্ষা করার জন্য তাদের মাথাব্যাথা ছিল না। তার ফল 'হিন্দুই হিন্দুর শত্রু'।

সনাতন হিন্দু দর্শন- স্বামী বিবেকানন্দ আগ্রা থেকে বারানসীর পথে চলেছেন, রাস্তার পাশে তাম্বাকু সেবনরত একজনকে দেখে তাঁরও তামাক খাওয়ার খুব ইচ্ছা হল। বাসনা জানাতেই তামাক সেবনরত ব্যক্তি আঁৎকে উঠলো; একজন সন্ন্যাসী তার গড়গড়ায় তামাক খেতে চায়! আতঙ্কে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটি বাক্য, 'হামি ভাঙ্গি আছে মহারাজ'। 'ভাঙ্গি'! অর্থাৎ মেথর! অস্পৃশ্য! তামাক সেবনের বাসনা ত্যাগ করে স্বামীজী এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। চলতে চলতে স্বামীজীর মনে উদয় হোল প্রশ্ন, এ আমি কী করছি? এ জগতের সর্বত্র, সবার মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান; শুধু মানুষই নয়, সর্বভূতে সমদর্শনই সনাতন শিক্ষা, আর আমি বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হয়েও...! ফিরে এলেন তিনি, তামাক চেয়ে নিয়ে তৃপ্তিভরে সেবন করলেন, তারপর এগিয়ে চললেন নিজের পথে। শ্রীশ্রী গীতার বাণীও তাই, কুকুরে-হাতিতে, মানুষে-পশুতে, ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে, সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখা, সবাইকে সমানভাবে দেখা। এটাই বৈদিক দর্শন, সনাতন হিন্দু দর্শন।

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রিকরুণয়ে ব চঃ।
নির্মমনিরহংকার সমদূঃখসুখক্ষমি।।
সন্তুষ্ট সততং যোগী জতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়।
মৈয়র্পিতমনোবুদ্ধি যমৎভক্ত স মে প্রিয়।।"

স্বর্বভূতে দ্বেষহীন, মৈত্রী ও করুণাভাবযুক্ত, মমত্বযুক্ত ও নিরহংকার, সুখ-দুঃখে সমভাব সম্পন্ন, ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস ও মন, বুদ্ধি সমর্পিত ব্যক্তি ভগবানের প্রিয়। এটাই মানুষকে ভগবানের উপদেশ।

"ঈশাবাস্যমীদংসর্বং যৎ কিঞ্চ জগতাংজগৎ।
তেনত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধ কস্যাসিদধনম।।" ঈশঃ উপঃ

এই গতিশীল বিশ্বের সর্বত্র ঈশ্বরের বাসভূমি, অন্যায় বাসনা না করে ত্যাগের মন নিয়ে ভোগ করবে। সর্বত্র, সবার মধ্য ঈশ্বরের অবস্থান যে ধর্মের বাণী, সে ধর্মে নীচতা, ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা থাকতে পারে না। মনুস্মৃতি সহ সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণগুলিতে প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ সুস্পষ্ট। প্রক্ষিপ্ত নির্ণয় পণ্ডিতদের কর্ম হলেও মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে সাধারণ পাঠকের কাছেও অনেক প্রক্ষিপ্তই ধরা পড়ে। বহু পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্র, ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে, সেইসকল গ্রন্থরূপে যা পাওয়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে সে গ্রন্থই নয়, অনেক পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। 'মনুস্মৃতি', যা হিন্দুধর্মের ভেদাভেদের আকার গ্রন্থ তা ভগবান মনুর সৃষ্ট বলা হয়। মনুর সময়কাল মহাভারতীয় ঘটনাকালের বহু পূর্বে। মনু মহাভারতীয় চরিত্রগুলো পূর্বপুরুষ।

কম করেও তিপ্পান্নতম পূর্বপুরুষ ও সেই হিসাবে আনুমানিক আরও দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মনুর সময়কাল। মহাভারতের ঘটনার সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময় নির্দেশ করেছেন। মিঃ কোলব্রুডের হিসাব অনুসারে মহাভারতীয় ঘটনার সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক, মিঃ উইলসনের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক, মিঃ এলফিনস্টোনের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক, মিঃ বুকাননের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক, মিঃ উইলফোর্ডের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ১৩৭০ আব্দ, মিঃ প্রাট সাহেবের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ আব্দ, মিঃ বেন্টলির হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ৫৭৫ আব্দ, মিঃ জ্যকিবের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ আব্দ, মিঃ ভিন্টারনিৎস-এর হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ আব্দ, কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব ২৪৫০ আব্দ, বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে খ্রীস্টপূব ১৯৫০ আব্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ১৪৩০ আব্দ, ঐতিহাসিক সুনীল চট্টোপাধ্যায়-এর হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ আব্দ, গীতাভাস্যকার জগদীশচন্দ্র ঘোষের মতানুসারে খ্রীস্টপূর্ব ৯০০ আব্দ, বৃহৎসংহিতা অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব ২৪৫০ আব্দ, ডঃ অতুল সুরের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ২৪০০ আব্দ, রোমিলা থাপারের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৭০০ আব্দ, মিঃ কারান্তিকরের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ১৯৩০ আব্দ, ডঃ দফতরীর হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ১১৬০ আব্দ, ডঃ সেনগুপ্তের হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ২৫৬০ আব্দ, ডঃ বৈদ্য ও ডঃ আঠাওয়ালার হিসাবে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ আব্দ।

সাদা হিসাবের খাতিরে মনুর সময়কাল মহাভারতীয় সময়কালের ১০০০ বৎসর পূর্ব ধরে নিলেও মনুর সময়কাল দাঁড়ায় আড়াই হাজার খ্রীস্টপূর্ব। মনুস্মৃতিতে গ্রীক, শক, হূনদের **কর্মানুসারে** চতুর্বর্ণাশ্রমে গৃহীত হবার কথা আছে। এদের ভারতে আগমন খ্রীস্ট জন্মের আশেপাশের সময়ে এবং তারও বহু পরে তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের সাথে মিশে যেতে শুরু করে। তাহলে যে জাতি মনুর সময়ের চেয়ে কম করে আড়াই হাজার বৎসর পরে ভারতে এলো, তিনহাজার বৎসর পরে হিন্দু জাতির সঙ্গে মিশে যাওয়া শুরু করলো সেই কথা তিনহাজার বৎসর পূর্বের মনস্মৃতিতে কিভাবে এলো? মনুস্মৃতির সংস্কৃত অত প্রাচীন সংস্কৃততো নয়, বৈদিক সংস্কৃতও নয়, অনেক আধুনিক সংস্কৃত। পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে মনুস্মৃতি সুঙ্গযুগে (পঞ্চম-ষষ্ঠ খ্রীঃ) রচিত হয়ে তিনহাজার বৎসর পূর্বের মনুর নামে প্রচারিত। এতে মনুর মতবাদ নাই তা নয়,তবে তাঁর মতবাদের সঙ্গে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যসমাজের চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়েছে। হিন্দুকে এখন লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে সে কি চায়। সমস্ত সংকীর্ণতা ছুঁড়ে ফেলে ভেদাভেদহীন ঐক্যবদ্ধ হিন্দুজাতি গড়ে তুলতে হবে। হিন্দুর আদি ও ভিত্তিই হলো বৈদিক দর্শন।

''অর্থকামেস্বসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে।

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।।''

অর্থ ও কামনাসক্ত ব্যক্তিদ্বারা হিন্দু ধর্ম কলুষিত, বিভক্ত, দুর্বল হয়েছে। এখন সময় তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার। শুদ্ধ ধর্মচেতনাই পারে জাতিকে সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠা দিতে। বেদ-উপনিষদ'ই সনাতন হিন্দুর ভিত্তি দর্শন। সমগ্র হিন্দু-দর্শনে যেখানেই

স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রের সঙ্গে বৈদিক দর্শনের মতভেদ হবে সেখানে বৈদিক মতই গ্রহণীয়।

হিন্দু ততদিনই থাকবে যতদিন অপর হিন্দু থাকবে

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।'

অর্জুন যাদের সঙ্গে নিয়েই সুখভোগ করতে চান যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষে সেই প্রিয় ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, পিতামহদের দেখে, তাদের অথবা নিজেদের বিনাশাশঙ্কায় যুদ্ধে যখন পরাঙ্মুখ, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের প্রতি এই উপদেশ। ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য অন্য হলেও এই উপদেশ চিরন্তন। সবাই নিজ ধর্মকে ভালোবাসে, হিন্দুও নিজ ধর্মকে ভালোবাসে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে প্রাণ দিয়েছে। হিন্দু হিন্দু হয়েই বাঁচতে চায়। কিন্তু অপরে কি হিন্দুকে হিন্দু হয়ে বাঁচতে দেবে? ইতিহাস সাক্ষী তা তারা দেবে না। বর্তমান তার জ্বলন্ত প্রমাণ, যেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে সেখানে হিন্দুর স্বসম্মানে বাঁচার অধিকার হারিয়েছে; মা-বোনেদের ইজ্জতের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, ধর্মাচারের অধিকার, জীবনের অধিকার হারিয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ধর্মের ভিত্তিতে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দুটি দেশ থেকে হিন্দু নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অথচ ভারতে কিন্তু অহিন্দু ক্রমবর্ধমান। শুধু সেখানেই নয়, ভারতের কাশ্মীরের হিন্দুই বাধ্য হয়েছে স্বধর্ম ত্যাগ করতে, নতুবা জীবন দিতে, নতুবা স্বভূমি ত্যাগ করতে। স্বাধীনোত্তর কালে হিন্দু সেখানেই আক্রান্ত হয়েছে যেখানে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ট, অথবা অহিন্দু দ্বারা শাসিত। বর্তমানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর এই ভারতবর্ষেও আঞ্চলিকভাবে যেখানে হিন্দু লঘিষ্ট সেখানেই নানা ভাবে আক্রান্ত। পালিয়ে আসছে হিন্দু ইসলামিক বাংলাদেশ ও পাকিস্থান থেকে, আসছে গরিষ্ঠ হিন্দুর ভারতে। ভারতেরই হিন্দুলঘিষ্ট অঞ্চল থেকে হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চলে হিন্দু পালিয়ে আসতে চাইছে। বিশেষ করে বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদহ্ ও দুই চব্বিশপরগণার জনবিন্যাসের দিকে তাকালেই দেখা যাবে এই পলায়ন চিত্র। পালিয়ে আসছে বা যাচ্ছে কোথায়? হিন্দুলঘিষ্ট বাংলাদেশ ও পাকিস্থান থেকে হিন্দুগরিষ্ট ভারতে ও ভারতেরই হিন্দুলঘিষ্ট অঞ্চল থেকে হিন্দুবহুল অঞ্চলে। কারণ? কারণ অহিন্দু দ্বারা হিন্দুর বিপন্নতা ও হিন্দুর কাছে হিন্দুর নিরাপত্তা। কিন্তু হিন্দু কি ভেবে দেখে যে এই পলায়ন নীতি, পশ্চাদ অপসারণ হিন্দুকে অতীতে যেভাবে বিপন্ন করেছে, বর্তমানে করছে, ভবিষ্যতেও সে ভাবেই বিপন্ন করে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে। হিন্দু নিজ হিন্দুত্বের সুরক্ষায় হিন্দুর দেশে, হিন্দু অঞ্চলে, হিন্দু গ্রামে বাস করতে চায়, হিন্দুর আশ্রয় ও সুরক্ষা পেতে চায়, কিন্তু সেই হিন্দু কি অপর হিন্দুর আশ্রয় ও সুরক্ষাস্থল হতে চেয়েছে? হিন্দুস্থানের, হিন্দু গ্রামের সুরক্ষাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে কখনো? সমগ্র হিন্দু জাতি হিন্দু দেশের জন্য ভেবেছে কখনো? হিন্দু নিজ হিন্দুত্ব রক্ষায় অপর হিন্দুকে আশ্রয় করলেও একে অপরের পরিপূরক ও হিন্দুত্বের রক্ষক হয়ে উঠতে চায় না। যখনই আক্রমণ, বিপন্নতা আসে নিজ হিন্দুত্ব ও জীবন রক্ষায় অপর হিন্দুকে, নিজ হিন্দু সমাজরূপ আশ্রয়স্থলকে অবলীলায় ত্যাগ করে। একে অপরকে আশ্রয়

গড়ে ওঠা হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করলেও এই সমাজের প্রতি, অপর হিন্দুর প্রতি, হিন্দু ধর্ম ও জাতির প্রতি যেন কোনো কর্তব্যই হিন্দুর নাই। একারণেই ভারতবর্ষের বিশাল জনসংখ্যার আশিভাগ হয়েও হিন্দুরা সকলেই একা; তাই দুর্বল, পলায়নরত।

অতীত ঐতিহাসিক কালে হিন্দু হিন্দুর পাশে না থাকায় নিজ ধর্মের পরম বন্ধুই চরম শত্রু হয়ে আঘাত হেনেছে, আজও হানছে, নিকট ঐতিহাসিক স্বাধীনতা অর্জনকালে খণ্ডিত ভারতবর্ষের পাকিস্থান অংশের হিন্দুর কথা ভারত ভূখণ্ডের হিন্দু ভাবেনি, পাকিস্থান অংশের পলায়ন সক্ষম হিন্দুও দুর্বল হিন্দুর কথা ভাবেনি তাই সেখানে হিন্দু বিলুপ্তির পথে। 'বিলুপ্তির পথে' কারণ সেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু, দুর্বল; তাই আগ্রাসন সেখানে হিন্দুকে গ্রাস করছে। এভাবেই সংখ্যাগুরু হিন্দুর ভারতবর্ষেও এই বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই চব্বিশপরগনার বহু গ্রাম, বাংলা ও অসমের সীমান্তবর্তী বহু গ্রাম হিন্দুশূন্য হবার পথে। এভাবে কি হিন্দু নিজেদের গণ্ডিটা দ্রুত ছোট করে আনছে না? এর পর কোথায় যাবে হিন্দু? যখন সংখ্যাগুরুত্ব হারাবে তখন কি করবে হিন্দু? যদি হিন্দু হিন্দুর কাছেই সুরক্ষিত হয়, যদি হিন্দু হিন্দুসমাজেই বাস করতে চায়, যদি হিন্দু হিন্দুই থাকতে চায় তবে হিন্দুকে পরস্পরের পরিপূরক ও রক্ষক হতেই হবে। হিন্দুকে স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ও কর্তব্যনিষ্ঠ হতেই হবে। হিন্দুকে হিন্দুর হৃদয় হতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ, স্বার্থপরতা ছিল, আছে, থাকবেও। কিন্তু যে স্বার্থপরতা নিজেকে, সমাজকে, জাতিকে, ধর্মকে, নিজ আপন জনকে, দেশকে বিপন্ন করে ক্রম বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায় তা স্বার্থপরতাও নয়; তা নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা, কাপুরুষতা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা।

চক্রব্যূহে হিন্দু

বেশতো খাচ্ছি-দাচ্ছি-বেড়াচ্ছি; চাকরি-ব্যবসা-চাষাবাদ করছি; বিয়ে করছি, সিনেমা-নাটক দেখছি আর বৌ-বাচ্চা নিয়ে ঘরের দরজা এঁটে ঘুমোচ্ছি। এর মধ্যে আবার চক্রব্যূহ, বিপদ, বিলুপ্তি আসে কোথা থেকে?

ভাই একটু গোণ্ডিটার বাইরে চোখ তুলে তাকান। আমি, স্ত্রী ও আমাদের বাচ্চা, ঘর থেকে কর্মক্ষেত্র আর কর্মক্ষেত্র থেকে ঘর, ব্যাঙ্কব্যালান্স আর 'সোনা ভালো করে পড়াশোনা করো নাহলে খাবে কি করে'র গণ্ডিটার বাইরে যে গ্রাম, সমাজ, ধর্ম ও দেশের আপনি একজন মৌলিক উপাদান সেই গ্রাম, সমাজ, ধর্ম ও দেশের অতীত ইতিহাসের শিক্ষা, বর্তমানের লাঞ্ছনা আর তার ফলস্বরূপ ভবিষ্যতের রূপরেখার দিকে। শুধু চেতনাকে ক্ষুদ্রতর গণ্ডিটার বাইরে এনে উন্মিলিত নেত্রে সামনে, পিছনে, চারিদিকে; স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের বাইরে সমাজ-ধর্ম-দেশরূপ বৃহত্তর পরিবারে আপনার দায়, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নিয়ে একবার তাকালেই দেখতে পাবেন ভোজনরসিকের থালার খিচুরির মতোই আপনার হিন্দু জাতিটা চারিদিক থেকে অপরের খাদ্য হয়ে নিঃশেষ হয়ে আসছে। যখন আমি এই লেখা শুরু করি (২০১২ সনের জুলাই মাসে) তখন আমাদেরই প্রতিবেশী দেশ পাকিস্থান থেকে অবশিষ্ট হিন্দুরা ফের ভারতে

আসতে শুরু করেছে। ভারত সরকারের কাছে তাদের আবেদন, হয় ভারত সরকার তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দিয়ে ভারতে বসবাসের অধিকার দিক অথবা পাকিস্থান সরকারের সঙ্গে কথা বলে পাকিস্থানেই হিন্দু জীবন ও ধর্মের সুরক্ষা সহ বসবাসের অধিকার প্রদান করুক। কারণ সেখানে হিন্দুর জীবন, অর্থ-সম্পত্তি, স্ত্রী-কন্যা, ধর্ম, সবই বিপন্ন। অন্ধ-ধর্মনিরপেক্ষ (প্রকৃত হিন্দু বিদ্বেষী) ভারত সরকার ও এ দেশের সংবাদ মাধ্যম কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি, কিছু জানিনার ভান করে চুপ করে থাকলেও কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে সে সংবাদ ও ভারতে আশ্রিত পাকিস্থানি হিন্দুর সাক্ষাৎকারে সেদেশে হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা উঠে আসছে। ধর্মাচরণের অধিকারে হস্তক্ষেপ, শরিয়তী আইনের আরোপ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ''কাফের হয়ে আমাদের দেশে বাস করছিস তাই সপ্তায় সপ্তায় টাকা দে, বউ দে, বেটি দে, না হয় ইসলাম কবুল কর।" তা ছাড়াও হিন্দুর মেয়ে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ, বিয়ে, জোরপূর্বক হিন্দুর ধর্মান্তকরণ, হুমকি, অত্যাচার, মারধোর, জীবনহানি করা জলভাত ঘটনা। পাকিস্থানী প্রশাসন! দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক কাফের হিন্দুর জন্য ইসলামিক পাকিস্থানী প্রশাসন প্রহসন মাত্র। তা ছাড়া সেই প্রশাসনের কর্তারাওতো বিধর্মী কাফের হিন্দুর শত্রু ইমানদার মুসলমান। অতএব সে প্রশাসন হিন্দুর জন্য নয়। তাই স্বাধীনোত্তর পাকিস্থানের পনেরো শতাংশ হিন্দু খিচুরি হয়ে আজ এক শতাংশেরও নীচে। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আমাদের পূর্ব প্রান্তে প্রতিবেশী বাংলাদেশে হিন্দুর অবস্থার কথা আলাদাভাবে বলার আর অপেক্ষা রাখে না। তাদের বড় ভাই পাক-স্থান (পাকিস্থান) অর্থাৎ পবিত্র ভূমির পবিত্র ভূমিপুত্ররা না-পাক অর্থাৎ অপবিত্রদের (কাফের হিন্দুদের) সাথে যে পাক ইতিকর্তব্য পবিত্রতার সঙ্গে পালন করে থাকেন ছোটো ভাই হিসাবে তারাও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। হিন্দু ভারতের দুই হিন্দু অংশ আর হিন্দুর জন্য নাই। শুধু তাই নয়, তারা হিন্দুর শত্রু রূপেই অবতীর্ণ।

অবশিষ্ট আছে বাকি ভারতবর্ষ, যা হিন্দুভূমি বা হিন্দুর একমাত্র নিজের দেশ। সেখানে কেমন আছে হিন্দু? এখানে ধর্মীও-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে কোন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে হিন্দু? কোন্ পরিণতির দিকে হিন্দুস্থান এই ভারতবর্ষের গতি? বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতারূপে একটাই শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং তা এই দেশেরই উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামিক দর্শন। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ততদিনে ভারতে হিন্দু শক্তির পুনঃরুত্থান ঘটেছে। অবশ্য ইসলামিক যুগের শেষের দিকে ঔরঙ্গজেবের কালেই যার সূচনা হয়ে বাহাদুর সাহের সময়েই ইসলামিক শাসন আনুষ্ঠানিকতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই এখন স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর হাতেই যাবে, আর এখান থেকেই উগ্র ইসলামিক প্রতিবন্ধকতার সূচনা। দর্শন কি? দর্শন হলো, মুসলমানদের ধর্ম আলাদা, আইন আলাদা, তাই হিন্দুপ্রধান দেশে হিন্দুর শাসনে মুসলমান থাকতে পারে না এবং তাই ভারতবর্ষের একটা অংশ মুসলিম দেশ রূপে তাদের জন্য চাই। তার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, হিন্দুর উপর হামলা, অসংখ্য জীবনহানি,

নারী-ধর্ষণ, লুঠপাঠ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ হানি। এই দাঙ্গার বর্ণনার এখানে প্রয়োজন নাই। দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদনে অনিচ্ছুক দেশীয় নেতৃবৃন্দের কাছে এই ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামা রোধের একটাই বিকল্প, তা হলো মুসলমানদের দাবীমতো ভাগ দিয়ে দেশে শান্তিস্থাপন। ফলস্বরূপ দেশভাগ ও চব্বিশ শতাংশ মুসলমানের জন্য ভারতের তেত্রিশ শতাংশ আলাদা হয়ে গিয়ে মুসলমানদের জন্য পাকিস্থানরূপ আলাদা ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। হয় আমাদের দাবি মানো নয়তো আমরা জানি কিভাবে তা আদায় করতে হয়, এবং তা হল দাঙ্গা, খুন, ধর্ষণ, লুঠপাঠ, অগ্নিসংযোগ। এই যাদের নীতি, যারা মনে করে কাফের দেশে কাফের শাসনে মুসলমানেরা থাকতে পারে না তারা নিজেদের ভাগটুকু আলাদা রেখে ফের এই নাপাক ভারতে মাত্র ষাট-পঁষট্টি বৎসরের মধ্যেই দ্রুত বংশবৃদ্ধি, অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে প্রায় কুড়ি শতাংশে পৌঁছে গেছে এবং বলা বাহুল্য ফের তাঁদের পূর্ব খেলার পুনরাবৃত্তির সূচনাও হয়ে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে আর দু-একটা ইন্সটলমেন্টেই হিন্দু ও তার হিন্দুস্থান শুধু ইতিহাসের পাতাতেই অবস্থান করবে।

বহু ধর্মান্ধ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ইসলামিক গোষ্ঠী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বহু পূর্বেই হিন্দুকে বিতারিত করে কাশ্মীরকে হিন্দুস্থান থেকে ইসলামিস্থানে রূপান্তরিত করার প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হয়েছে, কেরল রাজ্যে হিন্দু সংখ্যালঘু হবার পথে। সেখানেও হিন্দু বিভিন্নভাবে আক্রান্ত। ইসলামি ও খ্রীস্টানী শক্তি সেখানে হিন্দু নিপীরণ ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে তৎপর। ভৌগলিক অবস্থানগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলে কেরল এতদিনে দ্বিতীয় কাশ্মীর হয়ে যেতো সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসম ও পশ্চিমবঙ্গের ভারসাম্য দ্রুত পালটে যাচ্ছে। প্রতিবেশি বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক মুসলিম অনুপ্রবেশ এই দুই প্রদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে হিন্দুকে যেমন এক দিক দিয়ে বিপন্ন করছে, অপরদিক থেকে তেমনি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও শত্রু ও সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে। অপরদিকে হিন্দুরা ডাকাতি, লুঠপাঠ, জমির ফসল ও গবাদিপশুর অপহরণে অতিষ্ট হয়ে এই সকল এলাকা ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অন্যত্র চলে গিয়ে রাষ্ট্র ও হিন্দুবিরোধী অপশক্তিকে আরও সুবিধা করে দিচ্ছে। বিগত এক বৎসরেই পশ্চিমবঙ্গে দেগঙ্গা সোনারপুর, কোলকাতার পার্কসার্কাস, মালদহ জেলার উপর্যুপরি বহু ঘটনা, মুর্শিদাবাদের ঝাউবোনা, কিছুপূর্বের বেলডাঙার ঘটনা আসন্ন মহাবিপদেরই পূর্বাভাষ পেয়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে সিরাজল্যাণ্ডের দাবি পূর্বেই উঠেছে, মুর্শিদাবাদকে মুসলিমাবাদ করার চেষ্টা অল্প দিনেই হয়েছে। পূর্ব পদ্ধতিতেই মুসলমানদের জন্য ফের আলাদা রাষ্ট্রের দাবী ও তার জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠপাঠ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাঁদের ফের দেশের ভাগ দিয়ে শান্তি কিনতে হবেনা দেশীয় নেতৃবৃন্দকে ইতিহাস, পরিস্থিতি ও তার গতি থেকে সে আশ্বাস পাওয়া যায় না।

এই লেখা চলাকালীনই অসমের সীমান্তবর্তী কোকরাঝাড় ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে শুধু হয়েছে ব্যাপক দাঙ্গা ও তার রেশ পড়তে শুরু করেছে মুম্বাই সহ

দেশের নানা প্রান্তে। বাঙলাদেশের হিন্দুদের জন্য কি পরিণতি অপেক্ষা করছে ঈশ্বর জানেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আশি শতাংশ হিন্দু মূল্যহীন। মুসলমানেরা ধর্মীও স্বার্থভিত্তিক চেতনার দ্বারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, হিন্দুরা তা করে না। তাই দেশীয় সম্পদ, আইন, অর্থ, চাকরি, তোষামোদ দ্বারা মুসলমানরাই কেবল রাজনৈতিক পরিচর্যার অধিকারী, হিন্দুরা ব্রাত্য। হিন্দুর উপর আক্রমণ রাজনেতারা ও সরকার দেখতেও চায়না। তাঁদের হুকুমে সংবাদ সংস্থাগুলো চুপ করে থাকে অথবা বিকৃতভাবে পরিবেশন করে। গোধরা হারিয়ে যায় গুজরাটে। তাঁদের দৃষ্টিতে গুজরাট দাঙ্গা ও অযোধ্যার বিতর্কিত ধ্বাচা ধ্বংসের কথা বছরের পর বছর ফলাও করে প্রচার করায় উত্তেজনা ছড়ায় না, অযোধ্যা বিষয়ে হিন্দুপক্ষে কোর্টের রায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পক্ষপাতমূলক বলে প্রচার করা উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা নয়, কিন্তু পাকিস্থান ও বাংলাদেশের হিন্দুনির্যাতনের প্রতিবাদ তো দূরের কথা তাঁদের জন্য একটু সমবেদনা জানানোও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারি বলে পরিগণিত হয়। তাই সর্বশান্ত বাস্তুহারা, স্ত্রী-কন্যা-সম্পত্তিহারা শরণার্থী হিন্দুরা জীবন ও ধর্ম রক্ষার্থে হিন্দুস্থানে এসে হয় চরম অবজ্ঞা আর অবহেলার শিকার। আমাদের তথাকথিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী কলমচি সমাজ হিন্দু ও হিন্দুস্থান ধ্বংসের আর এক কারিগররূপে ঐতিহাসিক কাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। প্রাক ইসলামিক ও ইসলামিক যুগে এরা ধর্মাবতার হয়ে হিন্দুর ধর্ম ও শাস্ত্রের বিকৃতিসাধন করে হিন্দুকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভেদাভেদপূর্ণ, বিশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছে। ইসলামিক যুগে নৈয়ায়িক, তার্কিক, স্মার্ত, সমাজপতিরূপে সাধারণ হিন্দুকে ঘরের বাহির করে তাদের ইসলামীকরণ করেছে, আর অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির লোভে মুসলমান শাসকদের মন্ত্রী, সেনাপতি, বুদ্ধিদাতা, দালাল ও ভেদী হয়ে হিন্দুশক্তি দমন করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘায়িত করেছে। বৃটিশযুগে এরা পাশ্চাত্য চমকে অন্ধ হয়ে দেশী ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশী মানুষকে ঘৃণা ও পাশ্চাত্য ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যবহারে নিজেদের মুক্তি ও বৃটিশ দালালীতে নিজ আরাধ্য কর্মকে খুঁজে পেয়েছে। আর বর্তমানে তাঁরা প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, বুদ্ধিজীবী হয়ে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গালিদান, হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক প্রতিপন্নকরণ, হিন্দু শাস্ত্রসমূহের বিকৃত ব্যখ্যাকরণ দ্বারা হিন্দুর মানসিক শক্তি হরণ ও সংখ্যালঘু তোষণ ও তৈলমর্দন কর্মে নিয়োজিত।

"মনে রেখো, হিন্দু ধর্ম থেকে একজন চলে যাওয়া মানে শুধু একজন হিন্দু কমে যাওয়াই নয়, হিন্দুর একজন শত্রু তৈরি হওয়াও।" স্বামী বিবেকানন্দের সতর্কবাণী।

এভাবেই অতীত থেকে বর্তমানে হিন্দুই হিন্দুর, হিন্দুস্থানের শত্রু হয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে চলেছে। খ্রীস্টান মিশনারী ও ইসলামিক ধর্মপ্রচারকরা হিন্দুর অজ্ঞানতা, ভেদাভেদ, সম্প্রদায় ভিত্তিক ঘৃণা- সম্পর্কহীনতা-অস্পৃশ্যতা-নির্যাতনের সুযোগ নিয়ে ও পাশ্চাত্য-আরব্য অর্থে বলিয়ান হয়ে অবহেলিত হিন্দুর ধর্মান্তকরণে নিয়োজিত। হিন্দু সংখ্যা যত কমে আসবে হিন্দু ও হিন্দুস্থান ততোই বিপন্ন হবে। শিয়রে শত্রু দেখেও সুখকল্পনার জাল বোনার বিলাসিতা করার সময় নাই।

'যব দিল সে নেহি হুয়া, তব দিমাগ সে কাম লো।' আমরা হৃদয় দিয়েছি, ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েছি, প্রতিদানে আঘাতই শুধু পেয়েছি। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন কাউকে অস্বীকার করে না, কাউকে বিদ্বেষ করে না; কিন্তু যারা অপর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে স্বীকার করেনা তাদের রূপান্তর ঘটানো হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাধু সাবধান! নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশকে ভালোবাসা,তাকে রক্ষার চিন্তা করা, নিজ ধর্ম ও উত্তরপুরুষের জন্য সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়ার স্বপ্ন ও চেষ্টা অন্যায় নয়, অধর্ম নয়, বরং তাইই ন্যায়, ধর্ম ও আবশ্যিক কর্তব্য।

বিশ্বাসঘাতক হিন্দু

ইসলাম ধর্ম, খ্রীস্টান ধর্ম কেমন হবে; মুসলমান ও খ্রীস্টানরা কেমন হবে সে বিষয়ে হিন্দুর কোনো অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ নাই। হিন্দু তাদের সহিষ্ণু, উদার করতে পারবে না। হিন্দু যেটা করতে পারে সেটা হল, হিন্দু নিজেকে পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযুক্ত করে নিতে পারে। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পর তারাই আজও টিকে আছে যারা নিজেদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার যোগ্য করে নিতে পেরেছে। যারা তা পারেনি তারা হারিয়ে গেছে। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক প্রকৃতি নিয়মেরই অন্তর্গত। ধর্ম-সমাজ-সভ্যতার ক্ষেত্রেও খাদ্য-খাদক সম্পর্কের সাক্ষী দেয় ইতিহাস।

সনাতন হিন্দু জাতি এক অতি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বৈদিক দর্শনরূপে যে মহান আদর্শ, সংস্কার, জীবনাচার, জ্ঞান, হিন্দু জগৎকে দিয়েছে তার জন্য হিন্দু পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চে মাথা তুলে গর্বিত হতে পারে। শুধুমাত্র মানুষে মানুষে সমদর্শিতাই নয়, সর্ব জীব তথা সর্ব পদার্থে সমদর্শিতা, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ থেকে শুরু করে স্থূল পদার্থ পর্যন্ত একই ব্রহ্মের অবস্থানই শুধু নয়,জড় থেকে সর্বোচ্চ প্রাণীরূপে এক ব্রহ্মই প্রকাশিত ও তা এক ব্রহ্মেরই বিচিত্র রূপ। এই জগতের সবাই আমার ভাই, আমার আত্মীয়, ঈশ্বর এক, তার কাছে পৌঁছোনোর অনন্ত পথ, আকুলতা থাকলে সব মত সব পথেই তাঁর কাছে পৌঁছোনো যায়। একমাত্র হিন্দু দর্শনই বলে। এমন উচ্চাঙ্গ দর্শন আর কারো নাই। এত উদারতা আর কোনো ধর্মসম্প্রদায় দেখায়নি। সনাতন দর্শন এতই উদার ও সর্বব্যাপী যে পৃথিবীর সকল ধর্মসম্প্রদায় স্ব-স্ব ধর্মে থেকেও হিন্দু ধর্মের দর্শনগুলো গ্রহণ করতেপারে, জগতে আর কোনো ধর্মের এত উদারতা নাই। কিন্তু এত উন্নত দর্শন, এত উদারতা সত্ত্বেও হিন্দুর এক বৃহত্তর ইতিহাস স্বার্থপরতার, অসহিষ্ণুতার, অনুদারতার, প্রতারণার, সর্বপরি বিশ্বাসঘাতকতার। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতার। এবং বর্তমানও তাই। তবে তা অপরের সাথে নয়, হিন্দুর সাথে হিন্দুর, নিজ ধর্মের সাথে হিন্দুর, নিজ সংস্কৃতি-জাতি-দেশ এবং নিজধর্মীয় দর্শন, দার্শনিক ও মহাপুরুষদের সাথে হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতা। হিন্দুস্থানের পতন, হিন্দুর দুর্গতির ইতিহাস এক নির্বোধ বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

আদিম সভ্যতার এককতা থেকে মানুষ পরিবার গঠন করে পরিবারবদ্ধ হয়েছে, ক্রমে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সমাজ গঠন করে হয়েছে সমাজবদ্ধ। এসেছে ধর্মবিশ্বাস, এসেছে দেশভিত্তিক জাতীয়তা। ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাকে ভিত্তি করে গঠন করেছে জাতি। কিন্তু কেন? কারণ 'প্রয়োজন'। প্রয়োজন নিরাপত্তার, প্রয়োজন বিকাশের, প্রয়োজন টিকে থাকার, বংশ-চিন্তা-বিশ্বাসকে প্রবাহিত করার। সর্বোপরি জগতে টিকে থাকার সংগ্রামে নিজেকে শক্তিশালী করে যোগ্য করে তোলার। নিজেরই প্রয়োজনে মানুষ যে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, জাতি গঠন করেছে সেই সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র,জাতির মৌলিক উপাদান সেই এক এক জন ব্যক্তি। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও জাতিকে যদি একটা সরোবর রূপে ধরি তবে ঐ সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও জাতি ব্যক্তিরা সরোবরের মৎস। সেই সরোবর যদি দূষিত হয়, জঞ্জাল জমে, সংস্কারের অভাবে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তবে সরোবরের মৎসকুল বিপন্ন এমনকি বিলুপ্ত হবে। আত্মোৎসর্গিত মুনি, ঋষি, মনীষীদের প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ সনাতন হিন্দু জাতিরও দায়িত্ব সেই সনাতন হিন্দু সমাজরূপ সরোবরকে সংস্কৃত ও সুরক্ষিত রাখা। "ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতে।" ধর্মকে যে রক্ষা করে, ধর্মই তাকে রক্ষা করে। কিন্তু হিন্দু কি করেছে? যার দায়িত্ব ছিল সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন সনাতন বাণীকে প্রবাহিত করার, সকল মানুষের কাছে তা পৌঁছে দিয়ে তাদের বিকাশ ঘটানোর; সামাজিক ঐক্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করার; তাঁরা সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন থেকে সনাতন সমাজের বৃহত্তর মানুষকে বঞ্চিত করে তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, ধর্ম-দর্শন-অবতারচরিত্রকে ক্ষুদ্র গোষ্ঠিস্বার্থে বিকৃত করেছে। সাম্য-সমন্বয়-ঐক্যের পরিবর্তে ধর্ম ও সমাজকে বিভেদ-অনৈক্য-অস্পৃশ্যতা-ঘৃণাকে ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে হিন্দু জাতিকে ভেদাভেদপূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অসংবদ্ধ দুর্বল জীবনমৃত জাতিতে পর্যবসিত করেছে। ধর্ম ও দর্শনজ্ঞানহীন, ধর্ম ও সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য বিমুখ হয়ে উদরপূর্তির স্বার্থে ধর্মপ্রমুখ সমাজনেতা হয়ে ধর্ম ও সমাজকে শোযন করেছে ও করছে। যাঁরা রাষ্ট্র সুরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁরা নিজ দায়িত্বকে অস্বীকার করে দম্ভ অহমিকা-ক্ষুদ্রস্বার্থে অন্ধ হয়ে বিদেশি-বিধর্মী দ্বারা আক্রান্ত সনাতন হিন্দু ধর্ম, রাষ্ট্র ও জাতিকে রক্ষার পরিবর্তে তাদের আবাহন করেছে, তাদের ভৃত্যাগিরি করেছে, তাদের হয়ে স্বধর্ম-স্বজাতি বিনাশ করেছে। যখন হিন্দুর জীবন, ধর্ম, ধর্মস্থানের উপর চলেছে বিধর্মীর তলোয়ার; যখন লক্ষ লক্ষ অসহায় হিন্দু স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জীবন রক্ষার্থে স্বধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে; যখন একটার পর একটা হিন্দু লোকালয়, হিন্দু রাজ্য বিধর্মী অত্যাচারীর দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে, তখন তারা পারস্পরিক বিদ্বেষ আর ভৌগোলিক রাজ্যসীমার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে হিন্দুধর্ম, হিন্দুস্থান আর হিন্দুকে লুণ্ঠিত হতে দিয়েছে। সন্ত রামানুজাচার্য, যমুনাচার্য, মদ্ধাচার্য, গুরু রামদাস, গুরু নানক, সন্ত কবীর, দাদু, রুইদা, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, স্বামী জগৎবন্ধু, লোকনাথ বাবাজী, এমনকি মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অসংখ্য মনীষী মহাপুরুষ সাধুসন্তদের হিন্দু অবতার বানিয়েছে, ভগবান বানিয়েছে, ঠাকুরঘরের সিংহাসনে রেখে তাদের বাহ্যপূজায় মগ্ন হয়েছে, কিন্তু হিন্দুকে সংস্কারিত করতে, হিন্দুধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার দূর করে ধর্মের উত্থান ঘটাতে, মিথ্যা

ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করে প্রকৃত সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুকে সংগঠিত ও উন্নত করতে যে প্রয়াস করেছেন, যে উদাহরণ রেখেছেন, যে উপদেশ দিয়েছেন তা তাঁদেরই ভক্ত-পূজারী হিন্দু উপেক্ষা করেছে, অগ্রাহ্য করেছে, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

"দর্দ না জানে কই,
ঘায়েল কি দর্দ ঘায়েল যানে
অর না যানে কই...।"

এ বিশ্ববিজয়ী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের অশ্রুঝড়া নয়ন আর ব্যথাকম্পিত ওষ্ঠাধর নিসৃত মীরার ভজন। মহাসফল সন্ন্যাসীর মহাব্যর্থতার মহা অসহায়তা।

"হিন্দুরা মার খায়, পরিত্রাণ চায়, প্রতিকার চায়; কিন্তু হায়! যারা হিন্দুর কথা ভাবে, হিন্দুর কথা বলে, হিন্দুর জন্য প্রকৃতই কিছু করতে চায়, হিন্দু তাদের কথা শোনে না।" ... বলিষ্ঠ স্বাধীনতাসংগ্রামী ও হিন্দুদরদী রাজনেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অসহায়তার স্বখেদ প্রকাশ। কোনো একজন লেখক, নামটা আমি ঠিকঠাক মনে করতে পারছি না, হয়তো প্রমথনাথ বিশী, তিনি তাঁর পুস্তকে ভারতীয় মনীষীদের বিষয়ে আলোচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন শাস্ত্রে হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহে কোনো বাধা নাই, নিজের টাকা খরচ করে এবং যুক্তিতর্কের জোরে তিনি কিছু বিধবার বিবাহও দিয়েছেন হয়তো, কিন্তু বৃহত্তর হিন্দুসমাজের ব্যক্তিবর্গকে তিনি তা গ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে অসহায়। এক দৈত্যাকার প্রচণ্ড জড়তা হিন্দুকে গ্রাস করে রেখেছে, আর অসম্ভব রকম আত্মবিশ্বাসহীনতা হিন্দুকে করেছে সাহসহীন, উদ্যমহীন, অদৃষ্টনির্ভর। ফলে সে না নিজ বোধ থেকে, না শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে পূর্ণ উদ্যমে জেগে উঠতে পারে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য হিন্দু মনীষীরা এই অসহায়তায় ছটফট করেছেন। হিন্দু তাঁদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিই শুধু করেছে, আজও তাঁদের ভাঙিয়েই সংকীর্ণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে শুধু, কিন্তু সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্ররূপ বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে তাদের সাথে করেছে বঞ্চনা, আজও করে চলেছে। আজও হিন্দু নিজ ধর্মরক্ষায় অসহায়তা বোধ করে, বঞ্চনার কথা ভাবে, পলায়ন নীতি গ্রহণ করে কিন্তু তা আত্মকেন্দ্রিকতাতেই সীমাবদ্ধ।

বর্তমান ভারতে বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, সেকুলার রূপে কিছু মহানুভব মানবসম্প্রদায়ের স্বগৌরবে উদ্ভব হয়েছে। আর আছে চামচা-হাতা থেকে শুরু করে বড় বড় ডাবুহাতা, হাঁড়া-জালা পর্যন্ত হিন্দু রাজনীতিক কুল। এদের কথা অবশ্য যত কম বলা যায় ততই ভালো। তাছাড়া আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের আর কী বর্ণনা দেবে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু বরং অগ্নিস্তম্ভরূপ মহাদেবের কুলকিনারা পেলেও পেতে পারেন, এদের কুলকিনারা পাওয়া স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য। তাছাড়া অঙ্কুশ দিয়ে খোঁচালেও ওদের সুরসুরিটাও লাগবে না। অতএব, পাহাড় ঠেলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যাদের সমষ্টিগতভাবে

অবতার বললে আশাকরি অতিশয়োক্তি হবে না। বলা বাহুল্য যে এরা প্রায় সবাই হিন্দু সন্তান। অবশ্য হিন্দু সন্তান না হলে সেকুলার হওয়া যায় না। কারণ সেক্ষেত্রে ঘাড়ের উপর মাথা রাখা দায়। তা ইনারা কি করেন? ইনারা কলম ও বাক্য নামক দুই অমোঘ অস্ত্র দ্বারা হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু সংস্কার, এমনকি হিন্দু শব্দটারও নির্ভরযোগ্যভাবে শাপ-শাপান্ত করে থাকেন, প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটির প্রতি তাঁদের এতই মোহ যে সেই তকমার জন্য উন্মত্ত। আর এই তকমা হাসিলের সহজ পথ, যত পারো হিন্দুর বিষোদ্‌গার করো। এরা এতই নিরপেক্ষ যে হিন্দু ছাড়া অপর কারোর কোনো অপকীর্তি, অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার,সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মোন্মত্ততা, সন্ত্রাস, খুন, পরধর্মবিদ্বেষ, দেশদ্রোহিতা এদের স্পর্শ করতেই পারে না। এদের অনেকেই বা এদের অনেকেরই বাপ-ঠাকুরদা আবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান থেকে ধর্ম আর বৌ-বেটির ইজ্জৎ বাঁচাতে পালিয়ে হিন্দুস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। অহিন্দুর কাছ থেকে পালিয়ে হিন্দুস্থানে হিন্দুর প্রতি হিন্দুর এটাই তো কর্তব্যকর্ম। অথচ এরা কিন্তু কখনোই বিষোদগারের পরিবর্তে ধর্ম ও সমাজের সংস্কার, উন্নতি, ঐক্যের জন্য নিজেদের দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে আসেনি, আসেও না।

আর নাম যাদের মানবাধিকার কর্মী তাঁদের নাম জঙ্গী অধিকার বা সন্ত্রাসবাদী অধিকার বা দেশদ্রোহী অধিকার কর্মী হওয়াই বাস্তবোচিত হত। কারণ সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে তারা সচেতন নয়। ধর্মীয়ভাবে হিন্দু আক্রান্ত হলে, অত্যাচারিত হলে, ছিন্নমূল হলেও তাদের অধিকার তাদের কাছে মানুষের অধিকারের মধ্যেই পড়ে না। তাদের মাথাব্যথা ও সমস্ত তৎপরতা শুধু দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গী ও অহিন্দু ষড়যন্ত্রকারীরা সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন দ্বারা ঠিকঠাক স্বযত্নরক্ষিত হচ্ছে কি না তাই নিয়ে। আর আম হিন্দু! তাঁরা কিছু জানতে, বুঝতে, করতে চায় না। তারা শুধু নিভৃতে শঙ্কিত হতে আর অপরকে ছেড়ে স্বার্থপরের মত পলায়নকেই পবিত্র কর্তব্য করে নিয়েছে।

পরিবার গোষ্ঠী, ধর্ম, সমাজ, জাতি, কাঠামো যাই হোক এই কাঠামোতে মানুষের বসবাস 'মিথজীবিতা'। সেখানে তাঁরা একে অপরের পরিপূরক, রক্ষক, সেবক। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি, ধর্মের প্রতি, সমাজের প্রতি, জাতির প্রতি সমানভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য দ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে ধর্ম, যে সমাজ, যে জাতি, যে রাষ্ট্রে বাস করছি, ভোগ করছি, সুরক্ষিত হচ্ছি সেই ধর্ম, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্রের প্রতি নিজ দায়িত্ব সমভাবে পালন না করা, সেই আধাররূপ ধর্ম, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্রের বিষোদগার-বিদ্বেষ উদ্গীরণ অবহেলা নয়, স্বার্থপরতা নয়, কর্তব্য বিমুখতাও নয়, এমনকি বিশ্বাসঘাতকতাও নয়, তা মহাবিশ্বাসঘাতকতা।

উপায় কী?

এটাই প্রথম করণীয়। হ্যাঁ 'উপায় কী?' এই চিন্তাটাকে নিজের মস্তিষ্কে দয়া করে স্থান দেওয়াটাই প্রত্যেক হিন্দুর প্রথম আশুকর্তব্য। আর আমারও কিছু! না, আমারও এই হিন্দুধর্ম, হিন্দুস্থান, হিন্দুসমাজের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য, এই বোধটাকে জাগরিত করাটা দ্বিতীয় কর্তব্য। এই দুটো ভাবনা হিন্দু গ্রহণ করলে বাকি সবকিছু আপনা

থেকেই হয়ে যাবে। আমরা মায়ের কোলে জন্ম নিই, পিতা-মাতার দ্বারা পোষিত-লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠি; আমাদের স্ত্রী-পুত্রাদি সহযোগে সংসার হয়; মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদি নিয়ে পরিবারে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। মায়া-মমতা ও ভালোবাসা এবং আমাদের একের অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য দ্বারা আমরা সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকি। এদের মধ্যে কেউ যদি পরিবার থেকে সুবিধাটুকুই শুধু নেয় এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে তবে সে স্বার্থপর, চোর বলে নিন্দিত হয়। আবার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য বা সবাই যদি ঐরূপ হয় তবে ঐ পরিবার দুর্দশায় পতিত হয়। ঠিক তেমনি ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রও ব্যক্তির বৃহত্তর পরিবার। এই পরিবারেই আমরা লালিত-পালিত-পোষিত-সংস্কারিত হই, সুরক্ষিত থাকি। এই পরিবারের প্রতিও আমাদের দায়, দায়িত্ব ও কর্তব্য সমানভাবে আছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অস্বীকার ও এড়িয়ে চলাও অকৃতজ্ঞতা ও চুরি।

এই অকৃতজ্ঞতা ও চুরি ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রকেও বিপন্ন করে। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো পরিকাঠামো নয়, তা এক-এক জন ব্যক্তিরই সমষ্টিগতরূপ। হিন্দু ধর্ম ও সমাজও এক এক জন হিন্দুরই সমষ্টি। এই হিন্দু সমাজরূপ পরিবারের প্রত্যেকে যখন পরস্পর ভালোবাসার বন্ধন ও দায়িত্ব-কর্তব্যের চেতনা দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হবে হিন্দুজাতি তখন ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল না হয়ে শক্তিশালী ও বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠবে। তাই চেতনা চাই সর্বপ্রথম।

মেরুদণ্ড মানবশরীরকে ধরে রাখে আর মানবশরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে মস্তিষ্ক। বিশাল হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড তার ধর্ম ও ধর্মীয় চেতনা আর জ্ঞানই তার মস্তিষ্ক। হিন্দু জাতি সনাতন হিন্দু ধর্ম দ্বারাই একজাতি রূপে চিহ্নিত এবং এই ধর্ম দ্বারাই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এই ধর্ম, ধর্মীয় গ্রন্থাদি, দর্শন, বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার দ্বারাই সংযুক্ত। এগুলোই মেরুদণ্ড রূপে সকল প্রদেশ, সকল প্রান্ত, এমনকি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের হিন্দুকেই হিন্দুরূপে চিহ্নিত করে ও ধরে রাখে। স্বাভাবিকভাবেই মেরুদণ্ডের গ্রন্থনা ও দৃঢ়তা যেমন শরীরকে শক্ত করে ধরে রাখে তেমনি দর্শন-সংস্কারাদি বিষয়গুলো সকল হিন্দুকে এক শরীররূপে ধরে রাখে। অপরদিকে মেরুদণ্ডের ত্রুটি বা কোনো সংক্রমণ যেমন শরীরকে পঙ্গু তথা জীবনমৃত করে, তেমনি দর্শন-সংস্কার-আচারাদির বিকৃতি, সামঞ্জস্যহীনতা, অপপ্রয়োগ জাতিকে পঙ্গু ও জীবনমৃত করে, অন্তর কলহ সৃষ্টি করে, বহিরাক্রমণের সহজ লক্ষ্য বানিয়ে ক্ষয়িষ্ণু করে দেয়। এভাবেই হিন্দু জাতি বিশাল মহীরুহের মতো হয়েও বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে দস্যু, তস্কর, উগ্র ধর্মান্ধরূপ বজ্রকীটের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, আজও হয়ে চলেছে। তাই হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম, ধর্মীয় দর্শন-গ্রন্থাদি, দর্শন, বিশ্বাস, আচার, সংস্কারাদির উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা চাই। তার জন্য চাই জ্ঞান।

আমি পূর্বেই বার বার জ্ঞানের কথা বলেছি। হিন্দুর বৃহত্তর অংশকে ধর্ম ও সামাজিক জ্ঞান থেকে বহু শতাব্দী ধরে দূরে সরিয়ে রেখেছে হিন্দুরই একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা বৃহত্তর হিন্দু সমাজ নিজেই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন

পরিস্থিতিতে জীবনের সকল আবশ্যিক দিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ধনদৌলত-বিলাসব্যসনের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে জ্ঞানের জগৎ থেকে দূরে সরে গেছে বা দুইই ঘটার ফলে ফলতঃ ধর্ম-দর্শনাদির জ্ঞানের চর্চা ক্ষুদ্র ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এতে সেই গোষ্ঠী স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। ধর্মকেন্দ্রিক সমাজে ধর্ম হয়ে ওঠে তাদের স্বার্থসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। নিজেদের প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধি, অহমিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও শাস্ত্রকে নিজেদের অনুকূলে বিকৃতি ঘটায়। মুদ্রণপদ্ধতিহীন সেই সমাজে যা ছিল অতি সহজ। ধর্মের দোহাই দিয়ে রচনা করেছে নতুন নতুন ধর্মগ্রন্থ, সংহিতা। যার দ্বারা ভেদাভেদ, তস্য ভেদাভেদ, সংস্কারের নামে কু-সংস্কার, অস্পৃশ্যতা, সামাজিক গণ্ডী, অর্থহীন বাধা-নিষেধ, অনন্ত উপসম্প্রদায়ের রচনা করে সম্ভব হয়েছে তাঁদের অবিসম্বাদিত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম-শাস্ত্র-দর্শনজ্ঞানহীন বৃহত্তর হিন্দুসমাজের জন্য জ্ঞানজগৎ থেকে দূরে থাকা এবং এ বিষয়ে ঐ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ফলে তাদের বিধানকেই অন্ধ অনুসরণ করা ছাড়া কোনো পথ খোলা থাকে না। আর ধর্মের নামে অধর্ম , কু-সংস্কার, অস্পৃশ্যতা, অসংখ্য সমান্তরাল উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ, স্বজাতিবিনাশক গণ্ডী সৃষ্টি, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন করে মানসিকভাবে হিন্দুকে একে অপরের থেকে বহু দূরের বাসিন্দা বানিয়ে সনাতন জাতিকে হীনবল, দুর্বল, ভঙ্গুর করেছে। এই সনাতন হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলে তাকে সংঘবদ্ধ হতে হবে, আর সংঘবদ্ধ হতে বিভেদ রেখা মুছে মিলিত হতে হবে, আর শাস্ত্র ও দর্শনের দোহাই দিয়ে যে বিভেদ-বিন্যাস-অস্পৃশ্যতা তা দূর করতে ধর্ম-শাস্ত্র-দর্শনকে সঠিকভাবে জানতে হবে।

যা হিন্দুর অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কার, সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ দূর করে এক পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ করবে। আর তার জন্য সর্বাগ্রে আসতে হবে শিক্ষিত হিন্দুকে, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের।

বিকৃতবুদ্ধি কলমনবীশদের সমালোচনার জন্য করা সমালোচনা পড়ুন, ভক্তবৃন্দ ধর্মব্যবসায়ীদের রসবর্ষণে আবেগাপ্লুত হয়ে অশ্রুপাত করুন, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজে সত্যকে জানুন আর অপরকে অনুপ্রাণিত করুন।

ধর্ম কোনো অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন নিয়মের ঘনঘটা নয় যা মানুষকে উন্নত চরিত্রের পথে, শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শনের পথে, মনুষ্যত্বের পথে, দেবত্বের পথে না নিয়ে সঙ্কীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, ভেদাভেদ রূপ ঘৃণ্য, অমানবিক পঙ্কিলতায় ঠেলে দেবে। ধর্ম হল এক উন্নত জীবনদর্শন যা মানুষের অন্তর্নির্হিত সত্ত্বার বিকাশ ঘটায়। যেদিন হিন্দু সত্যস্বরূপ সনাতন হিন্দু ধর্মকে নিজ প্রচেষ্টায় সঠিকভাবে জানবে সেদিন এই হিন্দু ধর্ম সাম্যসমন্বয়রূপ মহামিলনের মহাক্ষেত্র হয়ে মহাশক্তির আধার হবে। প্রত্যেক হিন্দুকে শিক্ষা ও জ্ঞানে হতে হবে ব্রাহ্মণ; বলবীর্য, সাহসিকতা মুমুক্ষত্ব গুণে হতে হবে ক্ষত্রিয়; দেশ, জাতি, সমাজকে সমৃদ্ধ করতে হতে হবে বৈশ্য, আর ধর্ম, সমাজ, দেশ ও পরস্পরের সেবায় হতে হবে শূদ্র।

এক সময় জ্ঞানকাণ্ডকে পিছনে ফেলে সনাতন হিন্দু সমাজে যাগ-যজ্ঞাদি রূপ

ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ডের আচারসর্বস্বতা ও আড়ম্বর ধর্মাচারের স্থান নিলে এই আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধাচারণ করে বৌদ্ধ মতবাদের উদ্ভব হয় এবং তা আচার, কর্ম-সর্বস্য জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত প্রসারলাভ করে তাঁদের বুদ্ধের অনুগামী করে সনাতন ধর্মের লোপ ঘটায়। তখন হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এভাবেই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি অবক্ষয়ের মুখে পতিত হয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশিক কালেও দেখেছি ভারতের সনাতন হিন্দু জাতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, অস্পৃশ্যতা, কু-সংস্কারসর্বস্য হয়ে কূপমন্ডূকের মতো নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্য আবদ্ধ করেছে। ফলে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি জ্ঞানহীন শিক্ষিত হিন্দু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন নিজ সভ্যতাতে লজ্জিত, কুণ্ঠিত হয়েছে; আত্মগ্লানি ও হীনমন্যতা বোধ করেছে; পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে দলে দলে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। নিজ সভ্যতার মধ্য থেকে কু-সংস্কারমুক্ত জ্ঞানমার্গী প্রগতিশীল গোষ্ঠীরূপে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ সৃষ্টি হয়েছে। তারাও হিন্দুধর্ম থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে চেয়েছে।

অপরদিকে দেখি আচার্য শঙ্কর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সন্ত মনীষীরা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞানপরিশুদ্ধ ভক্তি দ্বারা হিন্দু জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটিয়ে জাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি, জ্ঞানই আত্মবলে বলীয়ান করে জাতিকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করে। অপরদিকে অজ্ঞানতা, কু-সংস্কার জাতিকে মানসিকভাবে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে। আজও সনাতন হিন্দু সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় একটা বৃহত্তর অংশ অজ্ঞানতাবশত শুধুমাত্র বাহ্য সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, আড়ম্বরকেই ধর্মরূপে চিহ্নিত করে তাতেই মত্ত হয়ে আছে।

হিন্দুর পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বা সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান যাই হোক দেখা যায় সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা যুবকই তাতে উৎসাহিত বা যুক্ত। উৎসবের জৌলুস, আড়ম্বর আর উপভোগ্য বিষয়গুলো উপভোগ আর দায়স্বরূপ চাঁদা দেওয়াতেই বাকি হিন্দুর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ। আবার উদ্যোক্তাদের উৎসাহের কেন্দ্রে ধর্ম ও সামাজিক কারণ যতটা তার চাইতে অনেক বেশি প্রদর্শন ও উপভোগ্যোতা। ফলে এই সকল আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শুধুমাত্র বাহ্য আড়ম্বরে পর্যবসিত হয়েছে।

'আমাদের একতা নাই।'; কি প্রয়োজন অত ভাবার? হতাশ হবার?

পূজা-পার্বণ, ধর্ম-সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য, সামাজিক মিলন ও ঐক্য সাধনের জন্য। পাড়া, গ্রাম, মহল্লা, লেন, আবাসন, যেখানেই হিন্দু থাকুক না কেন এই ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দু মিলিত হতে পারে, পরস্পর মিলিত হয়ে নিজেদের সম্পর্ক গভীর করতে পারে; ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, বর্তমান সময়ের গতি, স্বপ্ন ও বাস্তব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। দেখা যাবে এতেই তাঁরা পরস্পর একে অপরের কাছে এসে স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। কু-সংস্কার ও হীনমন্যতা দূর করে

স্বাভিমানী হয়ে উঠবে। নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আস্থা, বিশ্বাস ও গর্ব অনুভব করবে। একটা পাড়া, একটা গ্রাম, একটা আবাসন নিজেরা যখন ঐক্যবদ্ধ হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই সকল হিন্দু আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রত্যেক সমাজেই সেই সমাজের ধর্মগুরু, ধর্মনেতা, সাধু-সন্তরা ধর্মের সংস্কার, বিস্তার, ধারণ, উৎসাহ দান, ঐক্য সাধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই তাঁরা মানুষকে ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করে, স্বধর্ম-স্বজাতি-প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত করে ঐক্যবদ্ধ করে, ধর্মের জ্ঞান ও আচারকে ধারণ করে রাখে, ধর্মের বিস্তার ঘটায়। সনাতন হিন্দু সমাজেও সাধু-সন্ত ধর্মগুরু মুনি-ঋষিরা এইরূপ কর্মই করেছেন অতীতে। কিন্তু নিকট অতীত ও বর্তমানে কি আমরা তাঁদের সে ভূমিকায় পাচ্ছি? কেউ কেউ হয়তো পুরো দায়িত্ব পালন করতে চান, অধিকাংশ হয়তো ভক্তিভাবের বিস্তারের দ্বারা কিছুটা করেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই সার্বিক দায়িত্বের ধারেকাছেও যান না। তাছাড়া এই সন্ত ও ধর্মগুরুরা এত সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত যে তাঁরা নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না। সাধু বেশে অসাধু, ধর্মনেতার বেশে পেশাদার সাধু-সন্ত, ধর্মনেতার প্রতি হিন্দুর আস্থা ও সমর্পণ অনেকটাই বিনষ্ট করেছে। সমগ্র ধর্ম ও সমাজের জন্য চিন্তাহীনতা, কর্মতৎপরতার অভাব, এ্যারিষ্টোক্রেসির কারণে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর ধর্ম ও জাতীয় জীবনে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিতও নয়। তাঁদের উচিৎ নিজেদের দায়িত্বে কর্তব্যে সচেতন হওয়া, নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কালিমামুক্ত করা, ধর্ম ও সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে হিন্দু জাতিকে সচেতন ও সংহত করা। মুনি, ঋষি, ধর্মগুরু, সাধুসন্তরা উদ্বুদ্ধ হয়ে অতীতে যেভাবে হিন্দু জাতিকে পরিচালিত করেছেন সেভাবে হিন্দুর মার্গপ্রদর্শন করলে নিশ্চয় হিন্দু সঠিক পথে চালিত হবে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই বাঙলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সকল মানুষকেই শূদ্ররূপে ধরা হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উপনয়ন বিধি আছে, আমাদের দেশের অন্যান্য প্রদেশে এই নিয়ম প্রচলিত আছে, কিন্তু বাঙলায় যেহেতু ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া আর কেউ নাই তাই ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো উপনয়ন হয় না। শাস্ত্রে চার বর্ণের জন্য শর্মা, বর্মা, ভূতি ও দাস-এই চার উপনাম আছে যা ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে নামের সাথে ব্যবহৃত হয়। বাঙলায় পূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়াকর্মে শর্মা ও দাস-ই কর্তার নামের সাথে উপনামরূপে ব্যবহৃত হয় এ কারণেই। তাই গৈরিকধারী বিবেকানন্দ শূদ্র সন্তান হয়ে, শূদ্রের নিষিদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ ও গৈরিক ধারণের অপরাধে দক্ষিণ ভারতের কূপমন্ডূক ব্রাহ্মণদের দ্বারা আক্রান্ত হন। আমেরিকা প্রত্যাগত সনাতন হিন্দুর গর্ব বিবেকানন্দের সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হতেই অস্বীকার করেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমেরিকা ফেরত শূদ্র সন্ন্যাসীর স্পর্শিত ভবতারিণী বিগ্রহ পুরোহিতদের দ্বারা ফের অভিসিক্ত হয়। তবে কি স্বামী বিবেকানন্দ এই হিন্দু ধর্ম ও দর্শন জানতেন না? যিনি সনাতন হিন্দু ধর্মকে বিশ্বমাঝে স্বগর্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ভারতবর্ষকে জানার জন্য যাঁকে জানার কথা বলছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তিনি এই সনাতন ধর্মকে শুধু জানেনইনি, তাকে অনুভব করেছেন। তাঁর কথায়,

অনুভূতিতে, কর্মে প্রকাশ পায় বেদ-বেদান্তের জ্ঞান, উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা। তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মের মূর্ত রূপ। তিনি কি বলছেন? বলছেন, ''আমি যদি শূদ্র হই তবে তোমরাতো অস্পৃশ্য''।

যিনি জ্ঞানী, সত্যাশ্রয়ী, ত্যাগী, ঈশ্বরনিষ্ঠ, ধর্ম, সমাজ, দেশ ও জীবের জন্য সমর্পিত প্রাণ তিনিই ব্রাহ্মণ এ কথাই তো বুঝিয়েছেন তিনি। সেই সূত্রেই আজ তিনি মহান সন্ন্যাসীরূপে আমাদের ঘরে ঘরে পূজিত, প্রতিষ্ঠিত, সকলের প্রণম্য। এভাবেই অরবিন্দ ঘোষ হয়েছেন ঋষি অরবিন্দ, বিনোদ ভুঁইয়া হয়েছেন স্বামী প্রণবানন্দ। যে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা জপ্য তার শ্রষ্টা ক্ষত্রিয় যোনী সম্ভূত ঋষি বিশ্বামিত্র। ঋষি কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাস ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান, অর্থাৎ শঙ্কর বর্ণের পারাশর, কিন্তু নিজ গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঋষি ও বেদ-বেদান্ত, পুরাণাদির উপস্থাপক ও মহাভারতের স্রষ্টারূপে তৎকালীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত সনাতন হিন্দু সমাজের কাছে পরম পূজ্য। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় কুলজাত হয়েও আমাদের ভগবান। এই সকল মহান ব্যক্তিদের জীবন, কর্ম, উপদেশ অনুসরণই প্রকৃত পথ। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুর চেতনার অভাবটা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

কাশ্মীর ভ্রমণকালে এক মুসলমান মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে স্বামীজী তাঁর ধর্ম কি জানতে চাইলে মহিলা বললেন-''আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তাঁর দয়ায় আমি এক জন মুসলমানী''। স্বামীজী নির্দেশ করে দেখিয়েছেন যে হিন্দুর এই স্বাভিমান কোথায়। হিন্দুর সংক্ষিপ্ত সঙ্কুচিত উত্তর-''আমি হিন্দু''। আত্মবিশ্বাস আসে জ্ঞান থেকে; আস্থা, বিশ্বাস ও চর্চা থেকে; যার অভাব হিন্দু জাতির মধ্যে স্পষ্ট। তাই ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের সময়েও দেখেছি শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করছে। কারণ হীনমন্যতা। হিন্দু তাঁর ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদের খোঁজ করে না; তাকে জানা, বোঝা ও অনুভব করার চেষ্টা করে না; ফলে তাঁদের সামনে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত হিন্দুর অন্ধবিশ্বাস, অপভ্রষ্ট ধর্মাচার, ভণ্ড তপস্বীর আচরণ আর কিছু বাহ্য ক্রিয়াকর্মই হিন্দু-ধর্ম রূপে প্রতিভাত। আর এই বোধ থেকে তাঁরা যখন পাশ্চাত্যের চমকে চমকিত হল তখন তাঁদের সব কিছুই শ্রেষ্ঠ মনে হতে লাগল। আসলে নিজ ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের জন্য গ্লানি বোধ, যার ফল ঘৃণা ভরে নিজধর্ম ত্যাগ করে তাঁদের ধর্ম গ্রহণ। এ যেন যে ঘরে আমরা বাস করছি তার মাটির নিচে প্রোথিত অগাধ ধনরত্নের খোঁজ না জানা, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভিখারীর জীবন। তাই স্বামীজী স্বাভিমানে ভরপুর জাতি গঠনের জন্য ডাক দিয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতের জেগে ওঠার জন্য বেদান্তের জ্ঞানকেই অবলম্বন করার কথা বলেছেন। তাই তিনি ডাক দিয়ে বলেছেন ''ভারতের মুনি-ঋষি, ভগবান রাম, ভগবান কৃষ্ণ, সীতা, সাবিত্রী আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের আদর্শ; তাঁদের প্রদর্শিত পথই আমাদের চলার পথ। আমরা হিন্দু; আমি আমার ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য গর্ব বোধ করি, পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ববোধ করি, আমি নিজেকে হিন্দুরূপে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি, তুমি কেন নিজেকে হিন্দু বলতে লজ্জিত হবে?''

অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, ভেদাভেদ আর ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই তিনি বার বার গর্জে উঠেছেন, বলেছেন "মানুষ অমৃতের সন্তান, সকলের মধ্যেই এক ঈশ্বর বিরাজমান, তাই মানুষ কখনো অস্পৃশ্য-অচ্ছুৎ হতে পারে না; নিজেকে চেন, ওঠো, জাগো সামনে এগিয়ে চলো।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে নিজ কর্ম ও উপদেশ দ্বারা হিন্দুকে মার্গপ্রদর্শন করে গেছেন এমন আর এক জন মহান পুরুষ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। যিনি দেখেছেন হিন্দুর দুর্গতি, অনুভব করেছেন তার কারণ। শাস্ত্র বলে, "অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যঘ্রং নৈব নৈব চ, অজপুত্রাং বলিদদ্দাৎ দৈব দুর্ব্বল ঘাতকাঃ।" তাই তিনি বলেছেন, "জীবনসংগ্রামে দুর্ব্বলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী"। তিনি শক্তিশালী হিন্দুজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন, দেখিয়েছেন আমাদের। কিভাবে তা সম্ভব তার পথও দেখিয়েছেন। বলেছেন মহামিলনের কথা, যা থেকে আসবে মহাশক্তির জাগরণ। গড়ে তুলেছেন হিন্দু মিলন মন্দির, গড়ে তুলতে বলেছেন প্রতি গ্রামে গ্রামে, আদেশ দিয়েছেন আপামর হিন্দুকে সেখানে মিলিত হয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির শিক্ষা নিতে, ক্ষাত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হতে, ভেদাভেদ দূর করে এক জাতি এক প্রাণ এক ধর্মের আধারে মিশে যেতে। তিনি তাঁর অনুভূতি দিয়ে জেনেছিলেন হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, সামর্থ্য আছে, নেই কেবল সঙ্ঘশক্তি। সেটারই প্রয়োজন, হিন্দু যেদিন সঙ্ঘশক্তিতে জেগে উঠবে সেদিন এই বিশ্বে হিন্দু আর ক্ষয়িষ্ণু হবে না, সন্ত্রস্ত হবে না, লজ্জিত হবে না, আতঙ্কিত হবে না, হবে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর অজেয় জাতি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী সময়ে আদি এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্থাপক বোধ হয় আদি শঙ্করাচার্য। সনাতন হিন্দুর বিদ্রোহী সন্তান বৌদ্ধধর্ম যখন সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃতিলাভ করে এই সনাতন হিন্দু ধর্মকে বিলুপ্তির দোরগড়ায় এনে ফেলেছে ঠিক তখনই শঙ্করাচার্য এই দেশে আবির্ভূত হয়ে ছুটে চলেছেন এক প্রান্ত থেকে দেশের আর এক প্রান্তে। সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের যুক্তিজালে খণ্ডন করেছেন হিন্দুদর্শন বিরোধী মতবাদ, প্রতিষ্ঠা করেছেন সনাতন দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বকে, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নবজাগরণ ঘটিয়েছেন হিন্দু জাতির। ধর্মকে জাগরুক রাখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করেছেন অতন্দ্র প্রহরীরূপ শঙ্কর মঠ। শুধু তাই নয়, বর্বরদের হাত থেকে ধর্ম ও জাতিকে রক্ষার্থে সৃষ্টি করেছেন ক্ষাত্রধর্মী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের।

পরবর্তী সময় মুসলিম অধিকারের যুগে যখন একদিকে মুসলিম অত্যাচার, শোষণ, ধর্মান্তকরণ আর হিন্দুর অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ভেদাভেদের সমীকরণ একযোগে হিন্দুজাতিকে গ্রাস করে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে ঠিক তখনই ত্রাতারূপে আবির্ভূত হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। এক বার ভাবুনতো মোঃ বখ্‌তিয়ার খলজী কিভাবে মাত্র আঠারো জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া দখল করলো! মাত্র কয়েক শত সৈন্য নিয়ে কিভাবে বাংলাকে তছনছ করে দিলো! সামান্যতম ঐক্য, সামান্যতম চেতনা থাকলে কি তা সম্ভব হত? এবার দেখুন হিন্দুধর্ম বিরোধী অত্যাচারী কাজীকে শত শত সাধারণ মানুষ সঙ্গে করে কিভাবে দমন করেছিলেন মহাপ্রভু। হিন্দুর প্রকৃত রোগ যেমন

মহাপ্রভু ধরেছিলেন তেমনি ব্যাথিত মহাপ্রভু হিন্দুর ধর্মবিরোধী কুসংস্কার, ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা দূর করে সংঘবদ্ধ শক্তিশালী স্বচেতন জাতি গঠনের জন্য বেছে নেন ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজদীপ্ত দুই মহান পুরুষকে, মর্যাদাপুরুষোত্তর শত্রুনাশক শ্রীরামচন্দ্র ও ধর্ম সংস্থাপক মহাজ্ঞানী মহাযোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁদেরই হিন্দুর সামনে আদর্শরূপে স্থাপন করেন যাতে তাঁদের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে হিন্দুর নিজ কর্মপথ নির্ধারণ করতে পারে। অথচ বাঙলার মানুষ মহাপ্রভুর নামে, ভগবান রাম ও ভগবান কৃষ্ণের নামে শুধু কাঁদতেই শিখলো। সমস্ত ভেদাভেদ দূর করতে প্রয়াসী হয়ে যিনি ঘোষণা করলেন- ''শুচি হয়ে মুচি হয় যেই কৃষ্ণ ত্যাজে।''

আমাদের পথপ্রদর্শকদের চেতনা, কর্ম, পথ, নির্দেশ যদি আমরা অনুসরণের পরিবর্তে উল্টোপথে হাঁটি তবে এ হিন্দু কিভাবে বাঁচবে? তাঁদের অনুসরণই তো হিন্দুর মুক্তির পথ, উৎকর্ষের পথ, জয়ী হবার পথ; সে পথেই আমাদের এগোতে হবে। ধনুর্বাণ ত্যাগ করে অর্জুন যখন যুদ্ধে বিমুখ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে অহিংস বাণী শোনাননি; তুমি আমার ভক্ত, তোমাকে আমিই রাজ্য-ঐশ্বর্য-সম্পদ সহ সব কিছু পাইয়ে দেব, চল যুদ্ধ করে কাজ নেই-এ কথাও বলেননি; তুমি বাড়ি যাও আমি দেখছি-এ কথাও বলেননি। বলেছেন কর্মযোগের কথা, অধর্মের বিনাশের কথা, ধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা। বলেছেন-আমার কর্তব্য অকর্তব্য, প্রাপ্তব্য অপ্রাপ্তব্য কিছু নাই তবুও আমি প্রতিনিয়ত কর্মে নিয়োজিত থাকি, তোমার কর্ম অধর্মের বিনাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা, তা তোমাকেই করতে হবে, ওঠো পুরুষাকার অবলম্বন করো, শত্রু সংহার করো।

এটাই আমাদের পথ। অহিংসার সাথে ধর্মের রক্ষার্থে, প্রাণের রক্ষার্থে, জাতির রক্ষার্থে, দেশের রক্ষার্থে হিংসা; ত্যাগ, সংযম, বৈরাগ্যের সাথে পুরুষত্ব, বীরত্ব, মুমুক্ষত্ব।

প্রথমেই চাই জ্ঞান। জ্ঞানই পারে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে, ব্যক্তি ও সমাজের কর্তব্যকর্ম নির্ণয় করতে, সঠিক কর্মপথে পরিচালিত করতে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করতে, জাতি, সমাজ ও ধর্মকে স্বমহিমায় প্রবাহিত করতে। আর পুরুষাকার, বীরত্ব, মুমুক্ষত্ব এবং সেই জ্ঞানই পারে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

ছোটো বড়ো প্রখ্যাত মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রগুলো হিন্দুর ধর্মসামাজিক জীবনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এগুলোকে কেন্দ্র করেই হিন্দুর ধর্মীয় জীবন অনেকটাই আবর্তিত হয়, ধর্মচেতনার বিস্তার ঘটে, ধর্মকে মানুষ অনুভব করে, প্রেরণা লাভ করে। কিন্তু ভারতে হিন্দুর অধিকাংশ মন্দির, ধর্মক্ষেত্র, তীর্থক্ষেত্র তার কর্ম থেকে দূরে চলে গেছে দেখা যায়। ধর্ম ও দর্শনজ্ঞানচর্চা খুব কম ধর্মক্ষেত্রেই বর্তমান আছে। সেখান থেকে হিন্দুর জ্ঞান, চেতনা, ঐক্যবোধ, সাম্য, স্বদেশ-স্বজাতিপ্রেম, কিছুই আর পাবার নাই। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ধর্মের নামে শৃঙ্খলাহীন, আস্থা-বিশ্বাস-ভক্তিহীন ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পাণ্ডারাজ দ্বারা সমস্ত ধর্মক্ষেত্র অপহৃত হয়ে দর্শনার্থী লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়েছে। ভণ্ড সাধু-সন্ত, অসাধু ব্যবসায়ী আর আমোদপ্রিয়দের সহযোগে আমোদক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাই হিন্দু সেখানে ভক্তির টানে যায় না,

ধর্মলাভের জন্য যায় না, জ্ঞানার্জনের জন্য যায় না, নিজ ধর্ম-সংস্কৃতি-সমাজকে জানতে চিনতে মিলিত হতে যায় না; যায় পর্যটন করতে, বিনোদন করতে, হাওয়া পাল্টাতে আর ভগবানকে ঘুষ দিতে। আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে ভাবার, কিছু করার আছে, তার জন্য ভাবার আছে। এই সমস্ত পবিত্র আস্থাস্থলগুলোর আমূল সংস্কার প্রয়োজন, সেগুলোকে পুনরায় জ্ঞান ও ভক্তিচর্চার এবং তা বিস্তারের কেন্দ্র করে তুলে ধর্মসংস্কার ও জাগরণের কেন্দ্র করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রত্যেক সাধারণ হিন্দু থেকে সাধু-সন্ত, পূজারী, পাণ্ডা, সেবায়েত, প্রত্যেককেই বুঝতে হবে বাহ্য আড়ম্বর আর পেশাদারিত্বের আড়ালে যদি প্রকৃত ধর্ম, চেতনা, সংস্কার, ঐক্য হারিয়ে যায়; যদি এই ক্ষেত্ররূপ স্তম্ভগুলোর সঙ্গে হিন্দুর প্রাণের টান না থাকে, তবে অচিরেই এগুলো হিন্দুর জাতীয় জীবনের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কহীন হয়ে হিন্দু অধিকারের বাইরে চলে যাবে। দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ বাদ দিলে সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলো এখনও বিদেশী বিধর্মীর আঘাত, লুণ্ঠন, অপমানের চিহ্ন বহন করছে। সেই অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সংস্কার সাধন দ্বারা ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির চাইতে বৃহৎরূপে সার্বিক সুরক্ষা দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থকেও সুরক্ষিত করবে।

একটা প্রবাদ আছে, "**কুকুরে লেজ নাড়ে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু লেজ যদি কুকুর নাড়ে তা স্বাভাবিক নয়।**" অর্থাৎ লক্ষণ ভালো নয়।

কিন্তু এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের দেশের লক্ষণ হয়ে এখন লক্ষণীয়। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির শর্ত রূপে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের দিয়ে হিন্দুকে নিজদেশে স্বরাজ ও শান্তি কিনতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হিন্দুর উদারতা আর কিছুটাবা ইতিহাস আর জ্বলন্ত বাস্তবকে অস্বীকারের ফলে স্বাধীন ভূখণ্ডের ভারতবর্ষ নামক হিন্দু অংশ হল ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সংবিধান হলো ধর্মনিরপেক্ষ। এটা হিন্দু চিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ঠিক। কারণ হিন্দু সকল ধর্ম, মত, পথকে মেনে নেয়; সকলের অধিকারকেই সমানভাবে দেখে। কিন্তু এ কোন্ ধর্মনিরপেক্ষতা আমরা দেখছি? প্রায় ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘুই যেন ভূমিপুত্র ও সুপুত্র। তাঁদের চিন্তাতেই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনেতারা বিভোর, সমস্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী তাঁরা। তাঁদের উগ্র ধর্মোন্মত্ততা প্রসূত পরিকল্পিত রাষ্ট্রদ্রোহীতাও রাষ্ট্র নেতৃত্বের শাসনযোগ্য নয়, এমনকি সে বিষয় উচ্চারণযোগ্যও নয়। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী, চক্রান্তকারী, নৃশংস গণহত্যাকারী সাজা প্রাপ্ত ফাঁসির আসামী হলেও সে যদি সংখ্যালঘু (অর্থ একটাই 'মুসলমান') হয় তবে তার শাস্তি বাস্তবায়িত না হয়ে জামাই আপ্যায়নে হিন্দুর করের টাকায় সরকারি অতিথি হয়ে থাকবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চক্রান্ত, প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ, বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন ও তাতে ইন্ধন দান, সন্ত্রাসবাদী প্রেরণ করে মানুষের রক্তে তাণ্ডব নৃত্য, সেদেশে স্বল্প সংখ্যক হিন্দু নির্যাতন, কোন কিছুর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না, এমনকি মুখেও বলা যাবে না কারণ তাঁরা যে ধর্মের সেই ধর্মেরই লোক আমাদের দেশের সংখ্যালঘু, আর সেই সংখ্যালঘুরা অসন্তুষ্ট হবে। সর্বাবস্থায় তাঁদের খুশি করে চলতে হবে।

কিন্তু কেন? আমাদের রাজনেতারা কি সর্বংসহা? পূর্ণ অহিংস? তাঁরা কি "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না" নীতি অনুসারী? না, তা কক্ষনোই নয়। মারামারি-কাটাকাটি, বলপ্রয়োগ দ্বারা গ্রাম মহল্লা দখল করে সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক আনুগত্যে আসতে বাধ্য করা, চক্রান্ত, সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপহরণ, ধর্ষণ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে, ক্ষমতা দখল করতে এই সব কিছুই যে এদের প্রাত্যহিক কর্ম তা সংবাদপত্র খুললেই দেখা যায়। 'ক্ষমতা দখল'; হ্যাঁ ক্ষমতা দখলই একমাত্র উদ্দেশ্য যে কারণে ঐরূপ হীন চরিত্রের রাজনৈতিক বৃন্দ সংখ্যালঘু বিশেষণ প্রাপ্ত মুসলমানদের জন্য মহানুভব হয়ে পড়ে, প্রতিনিয়ত অশ্রু বিসর্জন করে; আর তাঁদের অপকীর্তির বিষয়ে অন্ধ হয়ে থাকে। লুঠতরাজের জন্য চাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠান, ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের জন্য চাই ভোট, ভোটের জন্য চাই সমর্থন; আর সমর্থন পেতে হলে সেবা করতে হবে, আনুগত্য দেখাতে হবে, কু-কীর্তিতে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে। মানা গেল ভোটের জন্য ন্যায় নীতিহীন রাজনেতারা তাঁদের পদলেহন করছে, কিন্তু ভোট কি শুধু কুড়ি শতাংশ মুসলমান দেয়? আশি শতাংশ হিন্দুর ভোটে কি তাঁরা নির্বাচিত হতে পারে না বা হয় না? হয়, তবে সে ভোট ধর্মীয় স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত নয়, আর অপরপক্ষে মুসলমান ভোট তাঁদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁরা আগে মুসলমান তার পরে ভারতীয় বা অন্য কিছু (অনেক মুসলমান নেতাই সগর্বে ঘোষণা করেছেন)। তাই তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে হয়, তোষামোদ করতে হয়, আশি শতাংশ হিন্দুকে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, প্রতারিত করে তাঁদের পদলেহন করতে হয়, চোখ কান বন্ধ করে তাঁদের ধর্মান্ধতাসহ সমস্ত অপকর্ম দর্শন ও শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হয়, তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করে চলতে হয়। আর আশি শতাংশ হিন্দু প্রদীপ দৈত্য হয়ে দাসরূপে রাজনীতিক রাষ্ট্রনেতা রূপ শয়তান যাদুকরদের ইচ্ছাপূরণ করে চলেছে। এ ভাবেই লেজ কুকুর নাচিয়ে চলেছে।

কিন্তু কিভাবে অল্প সংখ্যকরা নিজেদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শক্তিকে সংহত করে বৃহৎ শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারছে? তাঁরা কি কোন সেনাশিবিরে থাকা কমাণ্ডারের অধীনস্থ সেনাবাহিনী যে কমান্ডারের আজ্ঞামত সবাই চলছে? না। তাঁরা শুধু তাঁদের ধর্মীয় চেতনা দ্বারা সম্প্রদায়গত স্বার্থকে চিন্তাভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে তাই। ভারতবর্ষের মোট ভোটারের মাত্র ১৩.৪ শতাংশ ভোটকে সংহত করে মুসলমানরা যদি রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্র নেতাদের প্রভাবিত করে তাঁদের অনুকূলে পরিচালিত করতে পারে, তবে ৮৫ শতাংশ হিন্দু ভোটার স্বধর্ম-স্বজাতি চেতনার প্রকাশ ঘটালে কি হতে পারে তা বোঝার জন্য নিশ্চয় বোদ্ধা হবার প্রয়োজন নাই।

হিন্দু যদি হিন্দুই থাকতে চায়, হিন্দুকে যদি হিন্দু হয়ে বাঁচতে হয়, হিন্দু যদি লাঞ্ছিত না হতে চায় তবে তাঁকে নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জাতি ও অপর সকল হিন্দুকে প্রকৃতরূপে ভালোবাসতে শিখতেই হবে; হিন্দুরূপে হিন্দু জাতির অঙ্গরূপে নিজেকে দেখতেই হবে; হিন্দু জাতি, অপর হিন্দু, হিন্দুস্থানের স্বার্থ চিন্তা করতেই হবে আর তার প্রতিফলন ঘটাতেই হবে। **দেশের ৮৫ শতাংশ হিন্দু হিন্দুস্বার্থ চেতনার**

সামান্যতম প্রকাশ ঘটালেই এই সব রাজনেতা, রাষ্ট্রনেতারা রাতারাতি হিন্দুদরদী হয়ে উঠবে নিশ্চিত।

ধর্ম-সম্প্রদায় বলতে এক বিশেষ বৃহত্তর গোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের একজন মান্য প্রবক্তা থাকবে, একটা ধর্মগ্রন্থ থাকবে, এবং কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি-উপাসনারীতি থাকবে যা ঐ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সকলের প্রশ্নাতীতভাবে সর্বোচ্চ মান্য। সনাতন হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের দিকে তাকালে কিন্তু ঠিক এরকম বলে মনে হয় না। হিন্দুরা, বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, শৈব, শাক্ত, গানপত্য, বৈষ্ণব ইত্যাদি বহু মত-পথ-উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণকারী। হিন্দুধর্মের নাই কোনো প্রবক্তা, নাই একমাত্র আচরণ পথ। এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী যেমন হিন্দু হতে পারে তেমনি নাস্তিকও হিন্দু হতে পারে। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেও মহামুনি কপিল হিন্দুর আদর্শ ও প্রণম্য। তাই সনাতন হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। তাই মনীষীরা এই সনাতন হিন্দু ধর্মকে গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে এক বিস্তীর্ণ জীবনশৈলী রূপেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের ধর্মীয় রূপরেখায় এই সনাতন হিন্দু জীবনশৈলীও এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় রূপেই প্রতিভাত। তাছাড়া হিন্দুর আচার-আচরণ-উপাসনাপদ্ধতি ও বিশ্বাসে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত হিন্দুর আচার-আচরণ-উপাসনাপদ্ধতি ও বিশ্বাসে এক গভীর যোগসূত্র বর্তমান যা হিন্দুকে হিন্দুরূপে ও অপর ধর্ম-সম্প্রদায় থেকে আলাদা রূপে চেনায়।

এই ধর্মীয় আগ্রাসনের পৃথিবীতে যখন হিন্দু অপর ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর আগ্রাসনের শিকার তখন সকল উদারতা সত্ত্বেও নিজ অস্তিত্ব রক্ষার্থে সকল হিন্দুর এক দেহ, এক প্রাণ, এক শক্তি ও এক লক্ষ্যে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। এর জন্য চাই পৃথিবীর সমস্ত হিন্দুর একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রগাঢ় বন্ধন। কিন্তু গঠনতন্ত্র ছাড়া তা সম্ভব নয়, তাই তার জন্য চাই সংগঠন। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মীয় কাঠামোয় সংগঠন। হিন্দুকে সংগঠিত করতে অনেক হিন্দু সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য সংগঠিত হিন্দুজাতির গঠন হলেও, সেই উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক হিন্দুকে সংগঠিত করে কিছুটা সফলতা পেলেও অধিকাংশ হিন্দুর কাছে তাঁরা তেমন রেখাপাত করতে পারেনি। বরং বৃহত্তর হিন্দু সমাজ এই সংগঠনগুলোকে অপরাপর দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়রূপেই দূর থেকে দেখে থাকে। কেন তা সমীক্ষার বিষয়। কিন্তু আমি জানি যে, এই সকল হিন্দু সংগঠনগুলো প্রকৃত রূপেই হিন্দুকে সংগঠিত করার জন্য সৃষ্টি এবং সেই চেষ্টাই করে চলেছে। তবুও তাঁরা পুরোপুরি ব্যর্থ না হলেও সফলতা যে অনেক দূর তা বলাই যায়। তবে উপায়? ... আমি যা দেখেছি, যা বুঝেছি, তাতে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা থাকলেও একজন মুর্খ জ্ঞানহীন পুরোহিত বা একজন অতি সাধারণ গাছতলায় গাঁজা টানা অজ্ঞ সাধুবেশী বা একজন কুলগুরুর কথা ও উপদেশ হিন্দুর মনে যে পরিমাণ রেখাপাত করে, যেভাবে মানুষ তাঁদের অনুসরণ করে তা কোনো শিক্ষিত, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সমাজনেতার কথাতেও করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এরা হিন্দু সমাজের জন্য ভাবে না, হিন্দুর বিপদ ও তা থেকে উত্তরণের কথা ভাবে না ও কাউকে ভাবাতে চায় না, হিন্দু সমাজের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

চিন্তা করে না, শক্তিশালী হিন্দু সমাজের কল্পনাও করে না। ভারতবর্ষের বুকে যে সকল অতি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানি তাঁদের সকলেরই জনপ্রিয়তার মূলে দেখা যায় তাঁদের ধর্মীয় ভিত্তিকে। এমনকি মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলেও তাঁদের জীবন, কর্ম ও বাক্যে ধর্মকেই অবলম্বন করা। হিন্দু সে যে মত ও পথের অনুসারী হোক, সে যে রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসীই হোক, উচ্চশিক্ষিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্নই হোক বা অশিক্ষিত অতি সাধারণ ব্যক্তিই হোক ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যায় তাঁরা কেহই ধর্মীয় সংস্কারের উর্ধ্বে নয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা গৃহে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ আদি ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-আচরণকে অন্ধভাবেই অনুসরণ করে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জীবনে ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কার এতটাই গভীরে প্রথিত যে, হিন্দুকে ধর্ম যতটা প্রভাবিত করতে পারে তা অন্য কোনো কিছুই পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ তাই যথার্থই বলেছেন যে আমাদের প্রাণপাখি আমাদের ধর্মে। তাই হিন্দুকে উজ্জীবিত ও সংগঠিত করতে সনাতন হিন্দু ধর্মের ও তার গঠনতন্ত্রের সংস্কারই শ্রেষ্ঠ উপায়, হয়তো একমাত্র উপায়। এক্ষেত্রে প্রকৃত বর্ণাশ্রমিক বিন্যাসই প্রকৃত পথ। সেই পথে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের ভালোমন্দ বিষয়ে মাথাব্যথাহীন স্বার্থসর্বস্ব বাহ্যলক্ষণসার নাম-সর্বস্য ব্রাহ্মণের পরিবর্তে বিদ্বান, সৎ, ধর্ম ও সমাজের জন্য আত্মোৎসর্গে নিবেদিত হিন্দুদের প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণত্বে দীক্ষিত করে হিন্দুর মস্তিষ্ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যাঁরা হিন্দু সমাজের সর্ব নিম্ন স্তর,সমস্ত হিন্দু ঘর ঘর থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্তরে ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র দ্বারা সম্পর্কিত থাকবে। এ কাজের জন্য এগিয়ে আসা উচিৎ রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতসেবাশ্রম সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শঙ্করাচার্য মঠ সহ ভারতের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মন্দিরগুলোর, যাঁরা বিকৃত পরম্পরার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত গুণসম্পন্নদের হিন্দুর ঘরে ঘরে অন্বেষণ করে দীক্ষিত করবে ও উপযুক্ত সংস্কার প্রদান করবে। প্রতি হিন্দুর ঘর থেকে বীরভাব সমর্পিত প্রাণ তরুণ সৃষ্টি ও অন্বেষণ করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে ক্ষাত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করবে। প্রকৃত গুণসম্পন্ন ও কর্মকারীরা যখন হিন্দুর ঘর ঘর থেকে প্রতিনিয়ত উঠে আসতে থাকবে, গুণ ও কর্মহানিতে নিজ স্থান বিচ্যুত হতে থাকবে; যখন হিন্দুর একই পরিবার থেকে চার ভাই চার গুণ ও কর্ম অনুযায়ী চার বর্ণের কর্মে নিযুক্ত হবে; যখন জন্ম নয় গুণ ও কর্মই পরিচায়ক হবে, যখন বর্ণ উঁচু-নিচু বিভেদরেখা না হয়ে গুণ অনুযায়ী সামাজিক কর্মবিন্যাস রূপে মানুষের আস্থাস্থল হবে, যখন হিন্দুদরদীরাই হিন্দুর মস্তিষ্কস্বরূপ সমাজনেতা হবে, তখনই উত্থানশীল সংগঠিত হিন্দু সমাজের উদ্ভব সম্ভব। যখন হিন্দু পেশাসর্বস্ব, অহঙ্কারী, আত্মকেন্দ্রিক, লোলুপ, স্বধর্ম-স্বজাত্যাভিমানহীন, ধর্ম-শাস্ত্র-কর্ম-কর্তব্যজ্ঞান ও সামাজিক উদ্দেশ্যহীন, অপমান ও নিপীড়ণকারী, সামাজিক গণ্ডী দ্বারা সদাবিচ্ছিন্ন দূরবাসী সমাজনেতার পরিবর্তে প্রকৃত জ্ঞানী, দরদী, সৎ, ধর্ম ও সমাজপ্রেমী, হিন্দু ধর্ম-মন-মানসিকতার সংস্কারকারী কাছের মানুষকে সমাজনেতারূপে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-পুরোহিত রূপে পাবে ও তাঁদের দ্বারা ধর্ম ও সামাজিকভাবে সংস্কারিত হবে, পরিচালিত হবে, তখন শক্তিশালী হিন্দুজাতির উত্থান সম্ভব।

বর্জন নয় গ্রহণ

আচার, সংস্কারের ধুয়ো তুলে ধর্মচ্যুত, সমাজচ্যুত জাতিচ্যুত করে হিন্দু নিজেকেই ক্ষয় করে এসেছে। শত্রু সৃষ্টি করে ধর্ম ও জাতির উপর আঘাতকে আমন্ত্রণ করেছে। সনাতন হিন্দু জাতিকে ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্বল করেছে। গ্রীক, হুন, পারসিকরা সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও হিন্দু তাঁদের মর্যাদা দেয়নি। ভগবান বুদ্ধকে হিন্দু অবতারের মর্যাদা দিয়ে বৌদ্ধদের কাছে টানা হলেও সাধারণ বৌদ্ধদের হিন্দু ধর্মে ব্রাত্য, শূদ্র করার ফলে তাঁদেরও হিন্দু সেভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। হিন্দু যদি মিথ্যা অহমিকা আর কু-সংস্কারের দম্ভ ছেড়ে গ্রহণ করতে জানতো তবে হিন্দু জাতি আরও ভালো অবস্থানে থাকতো। আজও হিন্দু সেই কু-সংস্কার মুক্ত হতে পারেনি। আজও হিন্দু ধর্ম থেকে কেউ চলে যেতে চাইলে হিন্দু তাঁকে ধরে রাখতে কোনো প্রচেষ্টাই করে না। পাশাপাশি অবস্থানের ফলে হিন্দু যুবক-যুবতী অপর ধর্মীয় যুবক-যুবতীর সঙ্গে প্রেম বা বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়লে অপর ধর্মীয় যুবক-যুবতীকে নিজ ধর্মে গ্রহণ করার পরিবর্তে হিন্দু নিজ সন্তানদের, নিজ সমাজেরই অঙ্গকে ত্যাগ করে অপর ধর্মকে সমৃদ্ধ করে নিজেদের অপুরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। হিন্দুর এইরূপ আত্মঘাতী প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে বিধর্মীরা অতীতেও তাঁদের ধর্মসম্প্রদায়কে সমৃদ্ধ ও হিন্দুকে হীনবল করেছে, আজও তারা সেই কৌশল দ্বারা হিন্দুক্ষয় করে চলেছে। হিন্দুকে বুঝতে হবে, যে ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষকে সে গ্রহণের অযোগ্য মনে করছে সেই ধর্ম ও ধর্মাচার গ্রহণ করতে এক দিন সে বাধ্য হবে যদি হিন্দু এভাবে নিজ ধর্ম ও সমাজকে ক্ষয় করে চলে। ধর্ম কোনো ব্লাড গ্রুপ বা জেনেটিক কোড নয় যে হিন্দুধর্ম তা গ্রহণ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ধর্ম হল কোনো বিশেষ দর্শনের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও তার অনুগমন। যে যে ধর্মের দর্শনের বিশ্বাস রাখবে ও তার অনুগমন করবে সে সেই ধর্মের। তাই আজ ভারতবর্ষের মুসলমানদের পঁচানব্বই শতাংশ ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে গিয়ে পূর্বহিন্দু বা হিন্দু বংশদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আর হিন্দু নয়। তাই মিথ্যার ভিত্তিতে নিজেদের ক্ষয় না করে এখন গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হতে হবে।

ছোট্ট একটা কৌতুক গল্প কোথাও যেন পড়েছিলাম। সেটা এই রকম, বালকের প্রতি গুরুজনের উপদেশ, "পথে কখনও যদি বাঘের সামনে পড়ো তা হলে বাঘের চোখ থেকে কিছুতেই চোখ সরাবে না। তা হলে বাঘ তোমাকে আক্রমণ করবে না। এটা আমি এক বিশিষ্ট প্রাণীচরিত্রবিদের লেখা পুস্তকে পড়েছি।" বালক কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে চিন্তা করে উত্তর দিলো, "কিন্তু বাঘ যদি বইটা না পড়ে থাকে তবে তো সে এ বিষয়টা জানবে না, আর না জানলে এ নিয়ম তাঁর মানার কথা নয়, এবং সে আমাকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলবে।"

উপদেশ এবং বালকের সিদ্ধান্ত দুটো থেকেই বক্তব্য উঠে আসে,,সেটা হল, নিজে যে দর্শন জানি, যে দর্শনে ও নিয়মে বিশ্বাস করি ও মানি তা অপরে জানে, বিশ্বাস করে ও মানে কি না সেটা জানা নিরাপত্তার জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ **নিজের**

নিরাপত্তার জন্য অপরকে ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

সনাতন হিন্দু দর্শন বলে ঈশ্বর এক; তিনি নিরাকার, সাকার, এবং তারও উর্ধ্বে আরও কিছু; তাঁর অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, তাঁর কাছে পৌঁছনোর অনন্ত পথ, সব পথেই তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়, ভক্তি-ভালোবাসা দিয়ে যে-কোনো নামেই তাঁকে ডাকা যায়। অপর ধর্মমত তা নাও বলতে পারে, তাঁদের দর্শনের সে নমনীয়তা নাও থাকতে পারে। হিন্দু অপর ধর্ম, ধর্মস্থান, সম্প্রদায়কে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনকারী, অন্যায়কারী, পাপী মনে করে না; ছলে-বলে-কৌশলে তাদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করে উদ্ধার করার দায়িত্ব হিন্দুর, তা মনে করে না; অপর ধর্ম, সম্প্রদায়, ধর্মস্থান, দেশের উপর আক্রমণে হিন্দু বিশ্বাস করে না, এমন কাজ হিন্দু কোনোদিন করেও নি। কিন্তু অপরের দর্শন উল্টোটাও হতে পারে। তাই নিজ দর্শন দ্বারা অপরের বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে বিপদ আসতে পারে।

হিন্দু গ্রীক, শক, হুণ, পারসিক, মুসলমান, খ্রীস্টান দ্বারা আক্রান্ত, লুণ্ঠিত, অপমানিত হয়েছে; জীবন, জনপদ, ধর্ম, ধর্মস্থানের হানি সহ্য করেছে, তা সত্ত্বেও তাদের ভালোবেসেছে, তাদের ধর্ম, সম্প্রদায়, মতবাদকে স্বীকার ও সম্মান করেছে, কিন্তু কী পেয়েছে? প্রতিদানে বার বার পেয়েছে বীভৎস রক্তের হোলি। ভয়ঙ্কর ধর্মদ্বেষী জিঘাংসার বলী হয়েছে হিন্দু পদে পদে।

"আমার এতদিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, ত্যাগ, ভালোবাসা দ্বারা আমি একজন মুসলমানকেও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে আনতে পারিনি।" এক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকারোক্তি।

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম", "যত মত, তত পথ" হিন্দুই বলেছে, মেনেছে, আর কেউ নয়। সন্ত কবীর, সন্ত কামাল, এদের নাম, এদের মহানুভবতার কথা কোন মুসলমান ধর্মনেতার মুখে শোনা যায় না। সর্বধর্ম সমন্বয়কারী, সর্বধর্মে সমদর্শী শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব, সাঁইবাবা, সন্ত কবীর, শুধু হিন্দুরই আদর্শ হয়ে আছে। হিন্দুদেরই, হিন্দু নেতাদেরই দেখা যায় গীর্জায় গিয়ে খ্রীস্টান ভাইদের সঙ্গে প্রভু যীশুর সামনে প্রার্থনা করতে। মসজিদে, মাজারে গিয়ে প্রার্থনা জানাতে, সম্মান জানাতে, ঈদের নামাজে মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে,ধর্মীয় সীমারেখা মুছে দেবার চেষ্টা করতে। কোনো মুসলমান নেতাকে, মহানুভবকে কোনো মন্দিরে গিয়ে পূজা দিতে, অঞ্জলি দিতে কেউ কোনো দিন দেখেছেন? দেখেননি।

সমদর্শন, সার্বিক ভ্রাতৃত্ববোধ, অপর ধর্ম ও সম্প্রদায়কে সমভাবে মান্যতা দান, আক্রমণ ও আঘাত না করা হিন্দু আদর্শ হলেও অপরের আদর্শ নাও হতে পারে। তাই সাবধান! শুধুমাত্র নিজ দর্শন দ্বারা অপরকে না দেখে তাঁর দর্শন, তাঁর ধর্মীয় নির্দেশ, তাঁর স্বভাব ও আচরণ জানা ও সেইমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ অস্তিত্ব রক্ষার উপায়।

"হারে, তয় নাকি আজকাল ওই সব স্বদেশী-টদেশীদের সঙ্গে ম্যালাম্যাশা করছস?...তা তয় না যাইলে কী তরে বাদ দিয়াই দ্যাশ স্বাধীন হইব নাকি? ...তয়! তর যাওনের কি দরকার?" স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে অধিকাংশ স্বার্থপর ও ধূর্ত ভারতীয়েরই মনভাবের ব্যাঙ্গ উপস্থাপনা।

"স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে যতটা না বিদেশী জবর দখলকারী বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তার চাইতে অনেক বেশী লড়াই করতে হয় নিজ দেশের মানুষের সঙ্গে।"-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সখের স্বীকারোক্তি।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, জাতি, জীবন, সম্পদ, রাষ্ট্র রক্ষার্থে ইতিহাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত অধিকাংশ হিন্দুর স্বার্থপর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন মনোবৃত্তিরই রূপ এটা। **আমার কাজ, আমাকেই করতে হবে, এটা কী মনে হয় না? যদি তা না হয়, যদি মনে হয় অন্য কেউ করে দেবে আর আমি নিরাপদ দূরত্বে থেকে সুবিধাটুকু নেব তবে সাবধান! অতি চালাকের যা হয়, যা হয়ে আসছে, তাইই হবে।**

ছি ছি ! সাম্প্রদায়িকতা

জানি, অনেক মহানুভব হিন্দুসন্তান আছেন যারা এ লেখা পড়লে আঁতকে উঠে বলবেন, "ছি ছি কি ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা !" হয়তো তাড়াতাড়ি কোন গোপন কোণে বইটা লুকিয়ে রেখে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে ফেলবেন। এমনকি গঙ্গাজল বা গোবরজলে স্নানটাও করে ফেলতে পারেন। তারপর এক ক্যান বডি স্প্রে লাগিয়ে নিয়ে সন্ধিগ্ধ মনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বইটার গন্ধ এখনও শরীরে অবশিষ্ট আছে কি না তা শুঁকে শুঁকে দেখতেও পারেন।

কিন্তু কেন? কারণ, এত যেখানে হিন্দু, হিন্দু স্বার্থ, হিন্দু ঐক্যের কথা বলা হয়েছে সেখানে সাম্প্রদায়িকতা নির্ণয়ে আর কোন যুক্তির প্রয়োজনই নাই। তাই আতঙ্ক, ঐ ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য শব্দের লেবেলটা যেন গায়ে সেঁটে না যায়। আতঙ্ক, সাংঘাতিক আতঙ্ক হিন্দু শব্দে, হিন্দু স্বার্থের কথায়, হিন্দু ঐক্যের কথায়, হিন্দুর দুঃখের কথায়, যেন হিন্দু শব্দ আর সাম্প্রদায়িকতা শব্দ দুটি সমার্থক। তাই এই শব্দটা থেকে দূরে থাকতেই হবে, তাই যেমন করেই হোক এই শব্দটা বর্জনও আবশ্যক। যেমন ধরুন দুর্গাপূজা হিন্দুর বহুরূপে ভগবানের আরাধনার একটা দিক যা বাঙালী হিন্দুর সবচাইতে বড় উৎসবের আকার নিয়েছে। এই উৎসবের আড়ম্বর, জৌলুস, সকল হিন্দুর হৃদয় ও মনে আলোড়ন আনা সাড়া জাগানো প্রভাব, ব্যবসায়িক অর্থের আবর্তনের পরিমাণ, দুর্গাপূজা ও তা কেন্দ্র করে যে বিরাট উৎসব তাকে বাংলার সর্ববৃহৎ উৎসবের রূপ দিয়েছে।

এখন এই বড় আলোড়ন জাগানো উৎসবে নেতা-মন্ত্রীদের মানুষকে একটু-আধটু শুভেচ্ছা না জানালে তো চলে না, বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনেও একটু ওঁ নমঃ, একটু শুভেচ্ছা না জানালে মন ছোঁয়া যায় না। কিন্তু আবার হিন্দুর পূজা-পার্বণ নিয়ে মাতামাতি মানে সাম্প্রদায়িকতা, তাই তা বাঙালীর জাতীয় উৎসব, আর শারদীয়া দুর্গাপূজার দুর্গা বাদ গিয়ে নাম হলো শারদীয়া। আরে ভাই, এমন দেখেছেন বা শুনেছেন কখনও যে, বাঙালী মুসলমান, বাঙালী খ্রীস্টান তাঁদের পাড়া, মহল্লায় স্বাড়ম্বরে মা দুর্গার পূজা করে এই উৎসবকে পালন করছে? বরং দেগঙ্গা ঘটে, পূর্ববাংলায় তো প্রস্তুতির মাঝপথে পূজা বন্ধ করে দিয়ে প্রায়শই নিষ্কৃতি পেতে হয়।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কি? এটাকি খুব খারাপ কিছু? হিন্দুর দুঃখের কথা বলা, হিন্দু ঐক্যের কথা বলা, হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদ করা কেন অস্পৃশ্য সাম্প্রদায়িক

বিষয়? মুসলিম স্বার্থ, মুসলিম ভোট, মুসলিম ধর্ম, শুধু মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা, মুসলমানদের জন্য চাকরি, মুসলমান ইমামদের জন্য ভাতা, মুসলমান সেন্টিমেন্টকে তো কই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা বলে না কেউ? নির্বাচনের সময় ইমাম কর্তৃক মুসলমান ভাইদের কাছে মুসলমান স্বার্থে ভোট দেবার আহ্বানও সাম্প্রদায়িকতা হয় না। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মহান রাজনীতিকেরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ, যাদব, কুর্মি, হরিজন, ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, লিঙ্গায়েত, উর্দুভাষী, বাংলাভাষী, হিন্দিভাষী, প্রাদেশিক ভোটের হিসাব কষে, সেই সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে, পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উস্কে দিয়ে, পরস্পর বিভক্ত করে সম্প্রদায় ও প্রাদেশিকতা ভিত্তিক স্বার্থের চিন্তা প্রবেশ করিয়ে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে, সেটা সাম্প্রদায়িকতা নয়?

যে ব্যক্তি ব্যায়াম, দৌড়-ঝাঁপ, আসন, প্রাণায়াম, জুডো-ক্যারাটে চর্চা করে নিজেকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে চায়; রোগ-জীবাণু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত যোগ্য করে তুলতে চায়; নিশ্চয় তাঁকে কেউ ভয়ঙ্কর এবং অপরের শত্রু রূপ কোনো বিশেষ অবিধা দ্বারা ভূষিত করে না। দেশের কোন প্রদেশের মানুষ, যেমন বাঙালী যখন বাঙলার সংস্কৃতি চর্চা ও রক্ষার কথা বলে, বাঙলার ইতিহাস-ঐতিহ্যতে গর্বিত হয় ও তাঁকে তুলে ধরতে চায়, বাঙালীর ঐক্য ও সংহতির কথা বলে তখন নিশ্চয় সেটা বিহারী, পাঞ্জাবী, মারাঠী বিরোধী অশুভ মানসিকতা বলে নিন্দিত হয় না। ভারতবর্ষের মানুষ যখন জাতীয় সংহতি, ঐক্য ও শক্তির কথা বলে, তার চর্চা করে তখন নিশ্চয় সেটা আন্তর্জাতিক অন্যায় নয়। তবে হিন্দু-সংহতি, হিন্দু-সংস্কার, হিন্দু-সংগঠন, হিন্দু রক্ষার কথা বললে হিন্দু কেন সাম্প্রদায়িক, অপরাধী হবে?

অপরের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ বিঘ্নিত না করে, সংবিধানকে সম্প্রদায়ের স্বার্থে উল্লঙ্ঘন না করেও হিন্দু, হিন্দুর কথা কেন সাম্প্রদায়িকতা? নিজ দেশ, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন রক্ষার চিন্তা কোন অন্যায় নয় বরং মহৎ।

''শত্রুর শত্রু মিত্র হয়''। এই সূত্র অনুসরণ করে হিন্দুকে, হিন্দুর স্বার্থকে সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা চিহ্নিত করে অস্পৃশ্যতার লেবেল সেঁটে দিয়ে হিন্দুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও গালাগালি করে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিকভাবে কাছে টানার অমোঘ পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছে। আর এটাকে এত অস্পৃশ্য করে তোলা হয়েছে যে তা গায়ে লেগে না যায় সেই আতঙ্কে হিন্দু তটস্থ হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এইসব রাজনীতিকরা, তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যালঘু সন্তুষ্টিকরণের স্বার্থে সকল সংখ্যালঘুকেই হিন্দুবিরোধীরূপে চিহ্নিত করে সংখ্যালঘুদেরই সাম্প্রদায়িক, স্বার্থপর, হিন্দু বিদ্বেষীরূপে চিহ্নিত করে অপমান করছে।

আমার লেখার প্রথম অর্ধাংশ পড়ে অনেক হিন্দুই আমাকে পাপী, পামর, শাস্ত্র বিরোধী বলে চিহ্নিত করতে পারেন। যাঁরা এই লেখাকে ও আমাকে পাপী, পামর, শাস্ত্র বিরোধী বলবে, বা সাম্প্রদায়িক বলবে তাঁদের আমি দায়ী করব না। কারণ দায়ী প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অজ্ঞানতা, তাঁদের মনে গেঁথে থাকা কু-সংস্কার।

দর্শনশাস্ত্র বলে জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করে শাস্ত্রবাক্যও গ্রহনীয় নয়। সনাতন দর্শন ব্যক্তির নিজস্বতা, বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারবোধকে পাশে সরিয়ে রেখে অন্ধ অনুকরণের কথা বলে না। একই বৈদিক দর্শন তাই ব্যখ্যাত হয় অদ্বৈতবাদে, দ্বৈতবাদে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদে; একই বৈদিক দর্শনকে আশ্রয় করে তাই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন মত, পথ, উপাসনা পদ্ধতি; তাই একই বেদ-উপনিষদ-গীতার অনন্ত ভাষ্য ও বার্তিক রচিত হয়। অতি প্রাচীন এই সনাতন হিন্দুধর্মে কালের নিয়মে, ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের কারণে ও পরিস্থিতির কারণে বহু সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা প্রবিষ্ট হয়ে ধর্মীয় সংস্কারের নামে প্রচলিত হয়েছে; যার অনেক কিছুই সনাতন হিন্দুধর্মীয় সংস্কার নয়, বা সনাতন হিন্দুধর্মীয় আদর্শের বিপরীতে তাদের অবস্থান। এরকম বহু প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার হিন্দু আজ ত্যাগ করেছে। সংস্কারকগণ শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দ্বারা ঐসকল কুপ্রথার বিলোপের কথা বলে তখনও পামর, ধর্মদ্রোহী, কুলাঙ্গার, নাস্তিক অবিধা দ্বারা ধীকৃত হয়েছেন। হিন্দু সমাজ কিন্তু ধীরে ধীরে সংস্কারকগণের সংস্কারই গ্রহণ করেছে, কুসংস্কার রূপ বহু কুপ্রথাকে ত্যাগ করে নিজ ধর্মকে কলুষমুক্ত করেছে। যাঁরা হিন্দু ধর্মের নামে, হিন্দু শব্দে সাম্প্রদায়িকতা দেখে তাঁরা হয় প্রচলিত আবহ থেকে ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়, নতুবা তাঁরা এই শব্দের প্রচলিত ব্যবহার ও প্রয়োগ দ্বারা সম্মোহিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

যা সম্প্রদায়ভিত্তিক তাই সাম্প্রদায়িক। এতে আতঙ্কের, অস্পৃশ্যতার, ঘৃণ্যতার কিছু নেই যতক্ষণ না তা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে খর্ব করে, সাংবিধানিক ও মানবিক নিরপেক্ষতাকে উল্লঙ্ঘন করে। নতুবা সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সকল মতবাদগত ক্রিয়াকলাপ ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, ত্যাজ্য হত।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক হতে পারে না; হিন্দুর দর্শন ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, ত্যাজ্য হতে পারে না। কারণ হিন্দু দর্শন অপর কোন দর্শনকে অস্বীকার করে না, হিন্দু ধর্মাচার অপর কোন ধর্মাচারকে অস্বীকার করে না, হিন্দু ও হিন্দু দর্শন অপর কোন ধর্ম ও ধর্মস্থানে আঘাত করে না। তাঁরাই সাম্প্রদায়িক, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য হতে পারে যারা এগুলোকে সমর্থন করে ও এরূপ কর্ম করে।

এই লেখায় আমি যা লিখেছি তা ঐতিহাসিক সত্য, জ্বলন্ত বাস্তব, পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা ও তার সাবধান বাণী আর হিন্দুর দুর্বলতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা। হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষায় হিন্দু জাতির উন্নয়ন ও উদবর্তনের উপায় খুঁজতে যা যা উঠে এসেছে তাই তুলে ধরেছি মাত্র।

সত্যমেব জয়তে

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতদ্ পশুভিনরানম্।
ধর্মহি তেসামোধিক বিশেষ ধর্মেন হীনা পশুভিসমানা।।"

'হোমোসেপিয়ান্স সেপিয়ান্স' বৈজ্ঞানিক নামধারী মানব জাতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত পশু। শিম্পাঞ্জী, ওড়াংওটাং, গিবন প্রভৃতি বানর জাতীয় পশুদের সঙ্গে মানুষও আদি এক পূর্বজের সূত্রে প্রাণী জগতের 'প্রাইমেট' গ্রুপের

অন্তর্গত। বিবর্তনের ধারায় এই গ্রুপের এক সদস্য দ্রুত নিজেদের মস্তিষ্ক ও শরীরের বিকাশ ঘটিয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে বিকশিত ও উন্নততম জীবরূপে উঠে আসে। এরাই নিজেদের নাম দিয়েছে মানুষ। বিজ্ঞান বলে উন্নত জটিল মস্তিষ্কের গঠন আর শারীরিক গঠনই মানুষকে প্রাণী জগতের মধ্যে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে।

দর্শন বলে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি সহজাত প্রবৃত্তিগুলো মানুষ ও পশুর মধ্যে সামান্যরূপে বর্তমান, কিন্তু মানুষের অতিরিক্ত যা আছে তা ধর্মবোধ ও তার অনুসরণ। এই ধর্মই মানুষকে আর সকল পশু থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে।

এখন এই ধর্ম কী? ‘‘ধর্ম ধারয়ে প্রজা’’। ধর্ম হলো বিশেষ কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা তাঁর ধারকের পরিচায়ক হয়। এর একটা দিক হলো প্রাকৃতিক ধর্ম। আগুনের আলোক ও তাপ প্রদান, দাহিকা শক্তি; জলের শীতলতা, তারল্য, ঢালু দিকে বয়ে যাওয়া; প্রস্তর খণ্ডের জাড্যতা, চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্ত,প্রাণীর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কামচেতনা, নিদ্রা, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ধর্ম। এই বিশেষ গুণ ও কর্মরূপ ধর্মগুলো হারালে এরা নিজেদের পরিচয় হারাবে, অর্থাৎ এই গুণ ও কর্মরূপ ধর্মগুলোই এদের আলাদা আলাদা রূপে ধারণ করে আছে।

আর এক প্রকার ধর্ম আছে যা কেবলমাত্র মানুষেরই আছে এবং তা হল ক্রমোন্নতিশীল জীবন যাপন প্রণালী এবং সর্বশক্তিমান, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-পালন-সংহারকারী ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও কর্ম-অকর্মে বিশ্বাস। এই ধর্মও মোটামুটি ভাবে দুই প্রকার, আধ্যাত্মিক ও লৌকিক।

বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম বাদ দিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস; তাঁকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা রূপে বিশ্বাস; তাঁর প্রতি ভক্তি, আস্থা, বিশ্বাস রাখা ও তাঁকে পরম গতি ভেবে আরাধনা করা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকলেই এক মত। মতভেদ শুধু লৌকিক ধর্মের ক্ষেত্রে। আচার-আচরণ-নিয়ম-কানুন, পোশাক-আশাক, উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতিতে। তবে এখানেও সততা, দয়া, মায়া, সমর্পণ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য বোধ প্রভৃতি মানবিক গুণগুলোর উপর জোর দেবার ক্ষেত্রেও সকল ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে মিল রয়েছে।

লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ধর্মকে একত্রিত করে আবার যদি তাঁকে দুটো ভাগে ভাগ করি তবে দেখবো একটা ভাগে আসছে সত্য স্বরূপ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি সমর্পণের মানসিকতা, সততা, ন্যায়, দয়া, মানবিকতা, আর অপর ভাগে আসছে আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন, পোশাক-আশাক, উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতি । একটা দিক মানসিক ও মানবিক আর একটা দিক বাহ্যিক।

এখন ধর্মের লক্ষ্য কী? ধর্মের লক্ষ্য কি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা? দল বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তার? নিশ্চয় না। ধার্মিকের লক্ষণ কী? নিশ্চয় পোশাক-আসাক নয়। এমন কি আচার-আচরণের বাহ্য অনুসরণ, নিয়ম-কানুন, উপাসনা পদ্ধতিও নয়। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি বা তাঁর সান্নিধ্য , অনুগ্রহ, দয়া প্রাপ্তি। এক কথায় যাকে বলে ঈশ্বর লাভ। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে ‘‘রতনে রতন চেনে...’’। অর্থাৎ গুণিজনই গুণের কদর বোঝে। পাণ্ডিত্য দ্বারাই পণ্ডিতের মন

জয় করা যায়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়েই একজন ভক্তের স্নেহ লাভ করা যায়, আনুগত্য দ্বারাই মনিবের প্রিয় হওয়া যায়, এক জন ভালো খেলোয়ারের প্রিয় হয়ে ওঠে উদীয়মান খেলোয়ারি প্রতিভা। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, দয়াময়, ক্ষমাশীল, পবিত্র। ঈশ্বর সাধনার পথে, ঈশ্বর লাভের পথে, তাঁর অনুগ্রহ পেতে সত্য, জ্ঞান, দয়া, ক্ষমা, পবিত্রতাই হলো সেই মার্গ স্বরূপ। ঈশ্বর জগতের প্রভু, তাই ত্যাগ, ভক্তি, সমর্পণ দ্বারাই তাঁর প্রিয় হওয়া যায়। এই সত্য, জ্ঞান, দয়া, ক্ষমা, পবিত্রতা, ত্যাগ, ভক্তি, সমর্পণ, ঐশ্বরীক গুণ; এগুলোকে নিজ জীবনে অবলম্বন ও তাঁর অনুসরণ করাই ধর্ম।

আর এক ভাবে ধর্মকে দেখা যেতে পারে। মানুষ তাঁর উন্নততর মস্তিষ্কের কারণে ভাবতে পারে, কল্পনা করতে পারে, কামনা করতে পারে অপরাপর প্রাণীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি। অসীম কল্পনা ও কামনা শক্তির অধিকারী মানুষ তাই ইতর প্রাণীর মতো উদরপূর্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদাদী রিপুগুলোর সন্তুষ্টি করতে মানুষ তাঁর উন্নত মস্তিষ্কের দ্বারা ভয়ঙ্কর ক্রুর, হিংস্র, বিধ্বংসী হয়ে অশান্তি, অরাজকতার চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে নিজেদের জীবনকেই দুর্বিষহ করে তুলতে পারে, এমনকি মানব জাতির ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তাই চাই মানুষের এই সকল প্রবৃত্তিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ, যা তাঁকে নিয়ন্ত্রিত ও মার্জিত করে গঠনমূলকভাবে চালনা করবে। এখানেই প্রয়োজন সত্য, জ্ঞান, ক্ষমা, সংযম, ত্যাগ, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণের।

যে কারণেই হোক বা যে ভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন এই মহৎ গুণগুলোই ধর্ম। আর পোশাক-আশাক, আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ হল সেই বস্তু যা মানুষকে অন্যায়কারী, অহীৎকারী হওয়া থেকে বিরত করবে এবং যার অনুশীলন ও অনুসরণ ঐ মহৎ গুণগুলো অর্জনের সাহায্য করবে ও পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলবে। যখন সকল ধর্মমতই ঈশ্বরলাভকেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলে; সত্য, ত্যাগ, সেবা, ক্ষমা, সংযম, ভক্তি, দয়া, সমর্পণ প্রভৃতি মহৎ গুণগুলোর অর্জন ও আচরণকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের উপায় বলে; মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন করে পৃথিবীতে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন ধর্মে-ধর্মে বিদ্বেষ, সংঘাত, হানাহানি, অপরকে ছাপিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা আসে কি করে?

যখন মানুষ ধর্মের নামে অধর্মকে আশ্রয় করে, উদারতার স্থানে সংকীর্ণতাকে অবলম্বন করে, অসত্যকে সত্য বলে মনে করে, সংযমের পরিবর্তে উন্মাদনায় মাতে, দীনতার স্থানে মদমত্ত হয় তখন আসে বিদ্বেষ। যখন নিজ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও ধারণাকেই একমাত্র সত্য ও উপায় বলে মনে করে এবং অপর ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদকে ভুল প্রতিপন্ন করতে চায়, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ও সকল মানুষকে নিজ মতে আনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তখন আসে হানাহানি। যখন ধর্মচিন্তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা একাকার হয়ে যায়, তখন আসে দ্বন্দ্ব। যখন নিজেদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, তখন আসে ধ্বংস।

'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম', ''একং সদ্ বীপ্রা বহুধাবদন্তী'', নানা মুনির নানা মত; সত্য এক, জ্ঞানীরা বহুভাবে তাঁর বর্ণনা করেন।

পৃথিবীতে বহু ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছে। সকল ধর্মমতের উদ্ভবের কাহিনী ইতিহাস বলতে পারে না। কোনো কোনো ধর্মমত কোনো বিশেষ সময়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তি যাঁদের আমরা ঈশ্বরের পুত্র বা বান্দা বা অবতার বলে পূজা করি সেই মহান পুরুষদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে ও তাঁর অনুগত শিষ্যবৃন্দের দ্বারা পরিবর্ধিত, সুগঠিত, প্রচারিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো ধর্মমত কবে কিভাবে কোথায় কার দ্বারা উদ্ভব হয়েছে তা জানা যায় না। হয়তো মানুষের মনে জেগে ওঠা ধারণা, পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে আহরিত জ্ঞান, তৎকালীন ও পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণ ও নির্দেশিত পথকে অবলম্বন ও ক্রমোসংস্কারের মাধ্যমে সেই সকল ধর্মীয় মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

যে ভাবেই এই ধর্মমতগুলোর উদ্ভব হোক এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে। ফলে এই ধর্মসম্প্রদায়গুলোর আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, সামাজিক ব্যবস্থা, পোশাক-আশাক, বিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতিতে স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি, সমাজব্যবস্থা, জীবিকা, সমাজে পূর্ব হতে প্রচলিত প্রথা, কৌম বিশ্বাস, মানুষের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব, বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীনতার প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত। তাই এই বাহ্য বিষয়গুলোর বিভিন্নতা স্বাভাবিক। সময়ের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনও ঘটে। তাই এগুলো ধর্ম নয়। যা সত্য তাই ধর্ম, যা চিরন্তন তাই ধর্ম, যা স্থান কাল গণ্ডি ব্যক্তি গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে সার্বজনীন, সর্বকালীন তাই ধর্ম। জ্ঞান, ত্যাগ, ভক্তি, সত্য, দয়া, সেবা, প্রেম, সমর্পণ, ভ্রাতৃত্ব সর্বকালে, সর্ব স্থানে সবারই জন্য কল্যাণকর তাই এগুলোই সত্য ও চিরন্তন, ঈশ্বর সাধনার উপায়। ধর্মবোধ যত পরিমাণ মানুষকে সত্য, ন্যায়, ত্যাগ, সেবা, প্রেম, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করেছে আর কোনো দর্শন তা পারেনি। আবার এই মিথ্যা অহং সম্পন্ন ধর্মোন্মাদনা যে পরিমাণ হানাহানি ও রক্তক্ষয় ঘটিয়েছে তাও তুলনাহীন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় যোযুদ্ধমান (যুক্তি ও বাকযুদ্ধ) জগৎকে আহ্বান করে বলেছিলেন, '' এই ধর্ম ধর্ম করে বহু সংগ্রাম হয়েছে, বহু রক্তক্ষয় হয়েছে। আর নয়, এখন সময় হয়েছে সকল সংকীর্ণতার,সকল দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার। আর সকল ধর্মের মূল কথা তাইই।''

সকল ধর্মই যে শান্তি, প্রেম, ত্যাগ, সেবা, কর্তব্য-অকর্তব্য বোধ, শ্রদ্ধা, সমর্পণের কথা বলে তাইই ধর্ম, তাইই সত্য। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, তাই সেই সত্যেরই জয় হয়েছে চিরদিন, ভবিষ্যতেও তাই হবে। সকল মানুষের কামনা হোক 'সত্যের জয়', প্রার্থনা হোক 'সত্যমেব জয়তে'।

তথ্যসূত্র

ঋগ্বেদ সংহিতা - হরফ প্রকাশনী
মনু সংহিতা - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - উদ্বোধন কার্যালয়
শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - জগদীশচন্দ্র ঘোষ
মহাভারত - কালিপ্রসন্ন সিংহ
সাংখ্য দর্শন - শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, (কঃ বিশ্ববিদ্যালয়)
বিষ্ণুপুরাণ - আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন, (নবভারত পাবলিশার্স)
শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ- উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, (মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ)
কুরআন শরীফ - মৌলানা গোলাম মঈনউদ্দিন (মল্লিক ব্রাঃ)
উপনিষদ - অতুল্যচন্দ্র সেন, সীতানাথ তর্কভূষণ (বুকল্যাণ্ড)
বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা - ডঃ অসীত কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ নির্মল ভৌমিক, ডঃ মুরারী মোহন সেন, ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখ্যোপাধ্যায়, ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার,ডঃ প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত, ডঃ রুদ্রপ্রতাপ চক্রবর্তী।
হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য - ডঃ অতুল সুর, সাহিত্যলোক
ভূপেন্দ্র রচনাবলী বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ (১ম খণ্ড) - রাধারমন মিত্র ও সুধীর পোদ্দার, আকাদমি
বুদ্ধ ও বৌদ্ধ - বারিদবরণ ঘোষ, (করুনা প্রকাশনী)
নাম ও পদবীতে হিন্দু-মুসলমান শ্রী খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, (সঞ্চয়ন প্রকাশনী)
ভারতীয় দর্শন - দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, (কে. পি. বাগচী এন্ড কোং)
বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস - মনিকুন্তলা হালদার (দে), (মহাবোধি বুক এজেন্সি)
বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা (১ম) - উদ্বোধন
বাঙলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)- রমেশচন্দ্র মজুমদার
ছেচল্লিশের দাঙ্গা - সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, (উৎস মানুষ)
ধর্ম ও সমাজ - ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, (মিত্র ও ঘোষ)
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য - ঐ

ইসলাম ও সমকালীন দুনিয়া - মইনুল হাসান, (দীপ প্রকাশন)

কলিকাতার ইতিহাস - রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, (জে. এন. চক্রবর্তী এন্ড কোং)

বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন - ডঃ অতুল সুর (সাহিত্যলোক)

বাঙালীর জাতি পরিচয় - শৌরিন্দ্র কুমার ঘোষ (সাহিত্যলোক)

শ্রীচৈতন্য-অনন্ত জীবনের সত্যসন্ধানে -দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (সুবর্ণ প্রকাশনী)

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত - মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ

সংকেত পরিচিতি

ঋগ্বেদ-ঋগ্বেদ সংহিতা, মনু -মনু সংহিতা, চরক - চরক সংহিতা, পতঞ্জল - পতঞ্জল যোগসূত্র মহাঃ, মহাঃ ভাঃ - মহাভারত, বৃহঃ উপঃ - বৃহদারণ্যক উপনিষদ, গীঃ - শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, বিঃ পুঃ - বিষ্ণুপুরাণ, যাঃ স্মৃঃ - যাজ্ঞবল্ক সংহিতা (যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি), ভাঃ পুঃ - ভাগ্বৎ পুরাণ

কেন হিন্দুরা এরকম?

তথাগত রায়

মানুষের চেয়ে অনেক নীচ প্রাণী, একটা সাপ বা বেড়ালের লেজে পা পড়লে সে ফোঁস করে ওঠে। মানুষের মধ্যেও অতি দরিদ্র, আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অরণ্যবাসীরও যদি ঘর ভেঙে দেবার চেষ্টা করা হয়, বা মহিলার দিকে লোভের হাত বাড়ানো হয়, তাহলে সে উল্টে মারতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের যে কোনও মানুষকে যদি কোনওভাবে হেনস্থা করা হয়, তাহলে সে প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করবেই, প্রতিপক্ষ যদি প্রবল হয়, তবুও। এর আধুনিকতম উদাহরণ পাকিস্তানে ওসামা বিন লাদেন নামক নরপশুকে খুঁজে বের করে আমেরিকার তাকে হত্যা। কারণ সে আমেরিকার মাটিতে বহু নিরপরাধ মানুষের হত্যা ঘটিয়েছিল। শুধু একটি ব্যতিক্রম আছে। তার নাম-হিন্দু।

এই ব্যতিক্রমের চেহারাটা কী? সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলা প্রবাদ—কিল খেয়ে কিল চুরি করা। হিন্দুর, অন্তত বহু হিন্দুর স্বভাবের মধ্যে আমরা কুকীর্তি গোপন করার একটা অদ্ভুত চেষ্টা দেখতে পাই। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সে কুকীর্তি নিজের নয়, অন্যের এবং নিজের বিরুদ্ধে ধাবিত। আমি যদি মানুষ খুন করি, লোকের ঘরে আগুন দিই, নারীহরণ করি, তাহলে সেটা গোপন করার চেষ্টা আমি করবই। সেটা গর্হিত, কিন্তু একই সঙ্গে স্বাভাবিক। অপরপক্ষে আমাকে যদি কেউ খুন করার চেষ্টা করে, আমার ঘরে আগুন দেয়, আমার মা-বোনের হাত ধরে টানাটানি করে তাহলে আমার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি হবে? অবশ্যই, যে কোনও আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে—'প্রতিবাদ করা, প্রতিরোধ করা, প্রয়োজন হলে প্রতিশোধ নেওয়া'। কিন্তু যদি উল্টে আমি সেই হত্যাকারী, ঘরপোড়ানো বা কামুকের কাজের সপক্ষে সাফাই দেবার চেষ্টা করি, তাহলে আমাকে কী বলা হবে? 'মহান'? 'ক্ষমাশীল'? 'উদার'? নাকি বলা হবে ক্লীব, নপুংসক?

কোন্টা বলা হবে সেটা মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মূল্যবোধ ঠিক না ভুল সেটা কি করে সাব্যস্ত হবে? সম্ভবত এটাই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। মূল্যবোধ সামাজিক অবস্থার উপরে, ক্রমবিকাশের উপরে, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে, এমনকী ভৌগোলিক অবস্থানের উপরেও নির্ভর করে। একটা ছোট উদাহরণ দিই—শীতপ্রধান দেশের মানুষের কাছে রোদ জিনিসটা এত প্রিয়, যে সামান্য রোদ উঠুক বা একেবারে চাঁদিফাটা গরমই পড়ুক, তারা রোদ উপভোগ করার জন্য পাগল হয়ে যায় এবং

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমুদ্রতীরে এসে প্রায় নগ্ন বা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শুয়ে থাকে। এটা পুরোপুরি ভৌগোলিক অবস্থানজনিত এবং আমাদের চোখে বিকট, কিন্তু ওদের জিজ্ঞাসা করলে ওরা আশ্চর্য হয়ে বলবে, এতে আপত্তি করার কি আছে? আমি নগ্ন হয়ে রোদে শুয়ে আছি, আমি তো কারুর কোনও ক্ষতি করছি না! অপরপক্ষে, ধর্মীয় বিশ্বাস এই একই ব্যাপারে মানুষকে এমন উল্টোপথে চালনা করে যে, ভাদ্র মাসের অসহ্য ভ্যাপসা গরমেও রক্ষণশীল মুসলমান মহিলাকে বোরখা নামক তাঁবু পরিধান করে ঘুরতে হয়। সেই মহিলা যে সবসময় ব্যাপারটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেন তা নয়, প্রবল ধর্মবিশ্বাসে চালিত হয়েই হয়ত করেন, এবং কেউ আপত্তি করলে একই উত্তর দিতে পারেন—আমি তো কারুর ক্ষতি করছি না।

সামাজিক অবস্থার উপর মূল্যবোধের ভিত্তিটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ-এই হিন্দু বাঙালি সমাজেই, কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারে ধরা যাক, মদ্যপানের বিষয়ে যে মূল্যবোধ বিদ্যমান তা গ্রামের বা মফঃস্বল শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের মূল্যবোধ থেকে অনেকটাই আলাদা। ক্রমবিকাশের উপরেও মূল্যবোধ নির্ভরশীল। একসময় দস্যু, তস্কর ও পতিত হিন্দুদের মধ্যে নরবলি দিয়ে ভদ্রকালীর পূজা করা প্রচলিত ছিল। অনেকে বলেন, (আমার সন্দেহ আছে) বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণও নাকি প্রচলিত ছিল। আজকের দৃষ্টিতে এর প্রথমটি ঘৃণ্য, দ্বিতীয়টিও নিরানব্বই শতাংশের দৃষ্টিতে পরিহারযোগ্য। খৃস্টানদের মধ্যে মধ্যযুগে অবিশ্বাসী বা ডাইনি সন্দেহে মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত (যেমন জোয়ান অফ আর্ক-কে হয়েছিল)। পোপ দশম লিও ঘুষ নিয়ে লোকের পাপস্খলন করে দিত (যার প্রতিবাদে মার্টিন লুথার, কলভিন ইত্যাদিরা পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন)। আজকের খৃস্টান সমাজে নিশ্চয়ই কেউ এসব সমর্থন করবেন না। এই ক্রমবিকাশ ব্যাপারটা কিন্তু থমকে দাঁড়িয়েছে ইসলাম ধর্মে। ইসলামে কোনও প্রশ্ন করার বা সন্দেহ প্রকাশ করার সুযোগ নেই। কোরান (অর্থাৎ আল্লাতালার মুখনিঃসৃত বাণী) এবং হাদিস (অর্থাৎ শেষ নবী হজরত মহম্মদ যা বলতেন, করতেন, বা অনুমোদন করতেন)-কে একেবারে অনুভাবে মানতে হবে। যারা তা মানবে না তাদের বলা হবে 'মুনাফেক'। অর্থাৎ মুসলিম মূল্যবোধ পুরোপুরি কোরান-হাদিস-আশ্রয়ী এবং আদৌ ক্রমবিকাশযোগ্য নয়। এমনকী ইসলাম ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই। বলা হয়ে থাকে ব্যাখা বা 'ইজতেহাদ'-এর দরজা খৃস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে বন্ধ হয়ে গেছে।

এত কথা বলা হলো শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে, যে কোনও সমাজের মূল্যবোধ তৈরির নানা উপাদান আছে। সেই উপাদানের ভিত্তিতে মূল্যবোধ তৈরি হয় কিন্তু যে চারটে উপাদানের কথা বলা হলো, সেগুলো ছাড়া কি মূল্যবোধের অন্য কোনও উপাদান আছে? উত্তর, হ্যাঁ আছে, অন্তত ভারতীয় হিন্দুদের ক্ষেত্রে আছে। সেই উপাদানের নাম রাজনীতি। এবং এই নিবন্ধে আমার প্রমাণ করার উদ্দেশ্য যে এই পঞ্চম উপাদানটি (অর্থাৎ রাজনীতি) একটি ভয়ঙ্কর উপাদান এবং এটি হিন্দুর

মূল্যবোধকে আমূল বিকৃত করেছে। বস্তুত, 'হিন্দুরা কেন এরকম'-এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে এই পঞ্চম উপাদানের মধ্যেই। এবং (আমার মতে) হিন্দুর আসন্ন সর্বনাশের কারণ মূলত এর মধ্যেই নিহিত আছে।

কেন রাজনীতি ভয়ঙ্কর? তা তো আমি বলিনি, রাজনীতি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়, রাজনীতিবিহীন শাসনব্যবস্থা হচ্ছে পাকিস্তানে যা চলে। কিন্তু রাজনীতির উপর ভিত্তিকৃত মূল্যবোধ ভয়ঙ্কর। কারণ, রাজনীতির ভিত্তি নীতি নয়, রাজনীতির ভিত্তি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ, সেই স্বার্থের ভিত্তিতে টানাপোড়েন, কিছু দেওয়া, কিছু ছাড়া গোছের মনোবৃত্তি। সাময়িক লাভের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া, ক্ষমতার জন্য নীতিকে বর্জন করা। রাজনীতির মধ্যে নিশ্চয়ই আদর্শের একটা বড় জায়গা আছে, থাকা উচিত। অতীব দুঃখের বিষয়, সে জায়গাটা স্বাধীন ভারতে উত্তরোত্তর ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। এহেন রাজনীতির উপর যদি মূল্যবোধ ভিত্তিকৃত হয় তাহলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখের বিষয়, আজকের হিন্দু সমাজ এই সর্বনাশের শিকার এবং এই সর্বনাশ আমাদের হিন্দু সমাজকে আরও সমূহ সর্বনাশ অর্থাৎ অস্তিত্ব লোপের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। কি করে, সেটাই দেখা যাক।

এর সূচনা হয়েছিল ১৯২০-র দশকে, খেলাফৎ নামক এক আন্দোলনে হিন্দু সমাজকে সামিল করতে গিয়ে। করতে গিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) তুরস্ক জার্মানীর পাশে ছিল এবং হেরে যায়। এই যুদ্ধের আগে ইসলামী তীর্থ মক্কা-মদিনা তুরস্কের সুলতানের অধীন ছিল, ফলে সুলতানের অন্যতম উপাধি ছিল খলিফা, অর্থাৎ সমস্ত মুসলিমদের প্রধান। যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতিতে সুলতানের এই খলিফা পদ কেড়ে নেওয়া হয়, এবং তারই প্রতিবাদে খেলাফত আন্দোলন। এটি একটি সম্পূর্ণ পশ্চাদমুখী, মৌলবাদী আন্দোলন, এতে ভারতের মুসলমানের জড়িত থাকার কোনও কারণ নেই। হিন্দুর তো নেই-ই। কিন্তু গান্ধী 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য জোরদার করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনে হিন্দু সমাজকে সামিল করতে চেষ্টা করলেন এবং তারই ফলে সর্বনাশের সূত্রপাত।

গান্ধী অসাধারণ বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে ভারতবাসী ধর্ম ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন, ভারতবাসীর হৃদয় থেকে ধর্মকে উৎখাত করার চেষ্টা গঙ্গাকে সাগর থেকে ঠেলে হিমালয়ে তুলে নতুন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টার তুল্য। গান্ধী তাতে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন (যদিও কখনও খোলসা করে তা বলেননি)। সেজন্য তিনি রাজনীতিকের পোষাক না পরে সাধুর পোষাক পরলেন-খালি গা, হেঁটো ধুতি, রামধুন গান সম্বল করলেন। ফলে ভারতবাসীর যে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে মূল্যবোধ তৈরি হবার কথা ছিল, তার ব্যাখ্যা করে দিলেন রাজনীতিক গান্ধী। তিনি ধর্মের মোড়কে রাজনীতিকে দেশবাসীর কাছে এগিয়ে দিলেন। গান্ধী জানতেন, এই জিনিস হিন্দু সমাজ নিয়ে নেবে। এও জানতেন যে ইসলাম শুধু religion নয়, religion এবং,

politics, খোলা তরোয়াল হাতে যুদ্ধ করে এবং শত্রুকে ইসলাম কবুল করাবার বা শিরচ্ছেদ করার মাধ্যমেই ইসলাম ছড়িয়েছে। এই দুই রাজনীতিকে গান্ধী মেলাবার চেষ্টা করলেন, ভাবলেন এতে হিন্দু-মুসলমান- ঐক্য তৈরি হবে।

সেরকম কিছু হলো না, কিন্তু তুরস্কেই খেলাফৎ আন্দোলন ঘা খেল, প্রগতিবাদী, কোরাণ-হাদিস-বিরোধী কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় এসে খেলাফতই তুলে দিলেন, পর্দাপ্রথা ও ফেজটুপি পরা বেআইনী ঘোষণা করলেন এবং তুর্কী ভাষাকে আরবী হরফের বদলে রোমান হরফে লিখবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই খেলাফৎ আন্দোলন করতে গিয়ে ভারতবর্ষের মসজিদে মসজিদে যে অস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল তার কি হবে? সে অস্ত্র এবার প্রয়োগ হল হিন্দুর বিরুদ্ধে। মালাবার অঞ্চলের (বর্তমান কেরল) তথাকথিত মোপলা বিদ্রোহে প্রায় তিন হাজার হিন্দু খুন হলো, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমান পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশ) কোহাট শহরেও চলল হিন্দুমেধ যজ্ঞ। অমুসলমানকে নিধন করা কোরাণ-হাদিসে উচ্চ-প্রশংসিত পুণ্য কর্ম।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধী কিন্তু নীরব রইলেন। শুধু তাই নয়, খেলাফৎ আন্দোলনের প্রধান ধ্বজাধারী দুই ভাই, মৌলানা শওকত আলি ও মহম্মদ আলিকে প্রভূত প্রশংসা করতে লাগলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় কিন্তু পাল্টা প্রশংসা করলেন না। এর আর এক ফল হলো, একজন অত্যন্ত পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন মুসলমান ব্যারিস্টার, নাম মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি শুয়োরের মাংস খেতেন এবং নমাজ পড়া জানতেন না, তিনি গান্ধীর রকমসকম দেখে ঠিক করলেন, তিনিও religion কেন্দ্রিক রাজনীতি করবেন এবং তাই করলেন। তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিলেন, কালক্রমে পাকিস্তান দাবি করলেন এবং সেই পাকিস্তান হাসিলও করলেন।

কিন্তু গান্ধী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ছক ছাড়তে পারলেন না। হিন্দু সমর্থন তো তাঁর আছেই, এটা ধরে নিয়ে তিনি মুসলিম সমর্থন জোগাড় করার জন্য মুসলিম লীগের সঙ্গে (তোল্লা) পাল্লা দিতে মনস্থ করলেন। মুসলিমরাও অংশত তাঁর এই ডাকে সাড়া দেবার ফলে, কংগ্রেসের নীতিই হয়ে গেল, যে কোনও মূল্যে মুসলিম সমর্থন জোগাড় করতে এবং ধরে রাখতে হবে, এবং সে জন্য কখনোই কোনও অবস্থাতেই কোনও মুসলিমের কাজের নিন্দা করা চলবে না। পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণীত এই নীতি নেহরুও সাগ্রহে মেনে নিলেন, মৌলানা আজাদ তো এর পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে এর একমাত্র শক্তিশালী বিরোধী রইলেন সর্দার প্যাটেল। এই কঠোর বাস্তববাদী নেতা চিরকালই মনে করে এসেছেন, এই মুসলিম তোষণ অন্যায়, হিন্দু দোষ করলে যেমন তার নিন্দা করতে হবে, মুসলিম দোষ করলেও তাই-ই করতে হবে।

গান্ধীর এই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন আর একজন, তাঁর নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকর। কালক্রমে সাভারকরের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন এক যুগপুরুষ, বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে 'মুসলিম কোনও দোষ করলে চোখ বুজে থাকতে হবে'—এই গান্ধী প্রবর্তিত নীতির ভিত্তি অনেকটাই এঁরা টলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশের দশকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জেরে কংগ্রেস নেতারা জেলে গেলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে (১৯৪৫) যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন তখন হিন্দু জনমত তাঁদের সংগ্রামী নেতার মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নিল, সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ বেশিরভাগ হিন্দুসমর্থন হারালেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মুসলিম সমর্থন কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুসলিম লীগের কাছে চলে গিয়েছে। ১৯৪৫-৪৬ নাগাদ যখন ভারতের রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে মেরুকৃত তখনও কিন্তু গান্ধী-নেহরু সেই ঐক্যের গান গেয়ে যাচ্ছেন। এরই বশবর্তী হয়ে তাঁরা কলকাতার দাঙ্গা এবং নোয়াখালির হিন্দু হত্যার সামান্যতম প্রতিবাদও করলেন না, কিন্তু বিহারে যখন এর পাল্টা দাঙ্গা আরম্ভ হল তখন নেহরু বড়লাটকে পরামর্শ দিলেন, বিমান বাহিনী দিয়ে বিহারে হিন্দুদের উপর বোমা ফেলতে।

এই সব করতে করতে পাকিস্তান হয়ে গেল, এবং পূর্ব (ভারতীয়) পাঞ্জাব ও পশ্চিম (পাকিস্তানী) পাঞ্জাব থেকে যথাক্রমে সমস্ত মুসলিম এবং হিন্দু-শিখ বিতাড়িত বা নিহত হল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেও কোনও পক্ষকেই নিরস্ত করা গেল না। কিন্তু গান্ধী পাঞ্জাবে না গিয়ে কলকাতায় চলে এলেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বেলেঘাটায় এক বাড়িতে প্রার্থনা সভা করে পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ লোক বিনিময় রুখে দিলেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ঘাতক সোহরাওয়ার্দিকেও বাঁচিয়ে দিলেন। পূর্ব-পাঞ্জাবে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে লোক বিনিময় পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলায় কোনও বিনিময় হলো না। তারপর পাকিস্তান সরকার নিজেরা কোরাণ-হাদিস-নির্দ্দিষ্ট পথে অত্যাচার করে দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দুদের পূর্ববাংলা ছাড়া করতে আরম্ভ করল।

শ্যামাপ্রসাদ তখন কেন্দ্রে মন্ত্রী। ১৯৫০ সালের যখন হিন্দু হত্যা ভয়ানক আকার ধারণ করল, তখন শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে পরামর্শ দিলেন, পাঞ্জাবের মতো বাংলাতেও লোক বিনিময় করতে। নেহরু তখন আবার ঐক্যের স্বপ্নে ভাসছেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় কিছু পাল্টা মুসলিম বিতাড়ন হল। নেহরু তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে (লিয়াকৎ আলি খান) ডেকে এক চুক্তি করলেন, যার মূল কথা, দুটি দেশই নিজের নিজের সংখ্যালঘুদের দেখবে, তাদের যত্ন করবে। অর্থাৎ যে ডাকাতরা পূর্ববাংলার হিন্দুর ঘরে আগুন দিয়েছিল, তাদেরই ভার দিয়ে দিলেন সেই হিন্দুদের দেখভাল করা জন্য। ফল যা হবার তাই হলো। শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন, কিন্তু নেহরুর ঐক্যের স্বপ্ন টোল খেল না। প্রসঙ্গত, এই ব্যাপারটায় প্যাটেল আগাগোড়া শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু নেহরুর উপর জোর খাটাবার কোনও চেষ্টাই করেননি।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে প্যাটেল মারা গেলেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে

এক জঘন্য চক্রান্তে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হলো। নেহরুর উপর কথা বলার কেউ রইল না।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সালে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত নেহরু ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের মতো রাজত্ব করেছেন। নিজের অলীক ঐক্যভাবনা দিয়ে দেশভাগ ঠেকাতে না পারলেও অবশিষ্ট দেশের উপর তা পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। এও আবিষ্কার করেছেন যে, যে মুসলিমরা পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে থেকে গেলেন, তারা কংগ্রেসের বাঁধা ভোটার, এঁদের একটু তৈলমর্দন করলে প্রচুর ফয়দা মিলবে। তার ফলে 'হিন্দু কোড' তৈরি করেছেন, কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে পুরুষের বহুবিবাহ বা একতরফা বিচ্ছেদ (তিন-তালাক)-এর মতো বিশ্রী প্রথা লোপ করার কোনও উৎসাহ দেখাননি। এবং এইসব সমর্থন করার জন্য সেই 'বহুর মধ্যে ঐক্য' 'সেকুলারবাদ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে গিয়েছেন।

(নেহেরু নিজের বিষয়ে বলেছেন-I am a Hindu by accident, a Muslim by culture, and English by education and intellect, and a worshipper of the Soviet sun। নেহরু কমিউনিস্ট ছিলেন বলেই কমিউনিস্ট ভূপেশ গুপ্ত-র সঙ্গে নিজকন্যা ইন্দিরার বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। ইন্দিরা ফিরোজ খান-কে বিয়ে করলেন। নেহরু ও তাঁর পরিবারের মুসলিমপ্রীতি এবং হিন্দুবিদ্বেষ সর্ব্বজনবিদিত,ওঁদের আত্মীয়মহলেও।-ভাঃ সঃ)

কালক্রমে নেহরুর পাশে বহু স্তাবক জুটেছে। তার মধ্যে রাজনীতিক থেকে আরম্ভ করে তথাকথিত অধ্যাপক, পণ্ডিতরাও আছেন। তাঁরা বুঝে ফেলেছেন পণ্ডিতজী কী বললে খুশি হন এঁরা অনেকেই কংগ্রেসী নন, বরং কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন-কিন্তু এই বাবদে কংগ্রেসী ও কমিউনিস্টে প্রভেদ সামান্যই। তাই তাঁরা ইতিহাস বিকৃত করেছেন। মুসলিম অত্যাচারের কথা, বলপূর্বক ধর্মান্তরণের কথা গোপন করেছেন। বলেছেন, নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চ বর্ণের কাছে অত্যাচারিত হয়ে সাম্যের মন্ত্র ইসলাম কবুল করেছেন। তা সত্ত্বেও কেন দেশে এত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ থেকে গেলেন তার কোনও জবাব দেননি। অভীষ্ট ফল ফলেছে, পণ্ডিতজী খুশি হয়েছেন, এঁদের বড় বড় পদ দিয়েছেন, বিদেশ পাঠিয়েছেন। তার ফলে এঁদের ওজন বেড়েছে, এঁদের কথারও ওজন বেড়েছে। এবং কালক্রমে এই সব কথা, গান্ধী-নেহরুর চিন্তাই হিন্দু সমাজের বৃহদংশের মূল্যবোধে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে বেশিরভাগ হিন্দুর যে মূল্যবোধ, যার মূল কথা হল 'মুসলিমের দোষ দেখা চলবে না, দেখলেও চুপ করে থাকতে হবে'-এর মূল নিহিত আছে রাজনীতিতে। রাজনীতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধের বিপদ কোথায় তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। এর সঙ্গে এখন এক নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। দেশে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নামে হু-হু করে সৌদি আরবের টাকা ঢুকছে। সেই টাকার কিছু অংশ যাচ্ছে

সাংবাদিকদের পকেটে, কিছু অংশ রাজনীতিকদের পকেটে। ইন্ধন জোগাচ্ছে এই সর্বনাশা মূল্যবোধকে আরও জোরদার করার।

তাই আজকে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গত নয় বছর ধরে ভারতের সফলতম মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। কিন্তু কাশ্মীর থেকে সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দু বিতাড়নের ব্যাপারে তারা চুপচাপ। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত পশ্চিমবঙ্গের এক কোটি 'বাঙাল'দের বৃহদংশ পুরনো কথা মনে করতে চান না। তাই তৃণমূলের এম পি হাজি নুরুল ইসলাম এক মারাত্মক অস্ত্রধারী জনতাকে নিয়ে এসে হিন্দু মন্দির ভাঙচুর করে, আর সেটা জানাবার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করলেও সাংবাদিক জোটে না। তাই তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা-ছাড়া হতে হয়। তাই স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে ঐতিহাসিক তথ্যে ঋদ্ধ একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য, কেবল সেটি মুসলমানদের অপ্রিয় হওয়ার কারণে, হাজতবাস করতে হয়। কারণ, মূল্যবোধ অনুযায়ী, মুসলমান কোনও অন্যায় করতে পারে না।

এই বিকৃত মূল্যবোধ থেকে যদি হিন্দু সমাজ বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে ভারতে হিন্দুধর্মের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মুসকিল হচ্ছে, এ সম্বন্ধে কজন সজাগ? মূল্যবোধ বদল করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যদি না করা হয়, তাহলে যা হবার তাই হবে। এখনও সময় আছে।